

ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতা

দুই জীবনদর্শনের সংঘাত

আব্দুল্লাহ বিন বশির

শিক্ষক, মাদরাসাতুল আলী রা.,
পাঠানটুলি, শিবুমার্কেট, নারায়ণগঞ্জ



উঃজগ...

উস্তাদে মুহতারাম বেলাল সাহেব হাফিজাহুন্নাহকে^(১)

বিভিন্ন গাফলতি, অপারগতা আর অযোগ্যতার কারণে যখন অনেক আপন মানুষ আমার ওপর আস্থা পাচ্ছিল না, একটুখানি আশ্রয়ের জন্য উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরছিলাম, তখন আপনি আমার অপারগতা আর অযোগ্যতাগুলো জেনেও জায়গা করে দিয়েছেন, আস্থা রেখেছেন আমার ওপর এবং তত্ত্বাবধান করে বিভিন্ন কাজও উদ্ধার করেছেন।

আপনার সেই আস্থা আর তত্ত্বাবধানেরই একটি কাণ্ডজে রূপ হলো এই বইটি। আল্লাহ তাআলা আপনাকে ও আপনার নসলকে দ্বীনের জন্য কবুল করে উম্মতের বিজয়ের পথে নেতৃত্ব দেওয়ার তাওফিক দান করুক। আমিন।

^১ মুশরিফ, ইফতা বিভাগ মাদরাসাতু আলী রা., পাঠানটুলি, শিবুমার্কেট, নারায়ণগঞ্জ

শুরু কথা

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتَكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَغِطُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَدْعُوكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي، فَاعْفُ رِئَايَ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

এক.

বইয়ের একদম শুরুতেই একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন—এটি কোনো অ্যাকাডেমিক বা শাস্ত্রীয় গবেষণাধর্মী বই নয়। শাস্ত্রীয় গবেষণাধর্মী বইয়ের যে উসূল ও নীতিমালা রয়েছে, এখানে তা অনুসরণ করা হয়নি। বরং পশ্চিমা সভ্যতার মৌলিক দিকগুলো এবং সমাজে এর ক্ষতিকর ও ঈমান-বিধ্বংসী প্রভাবগুলো সহজ-সাবলীল ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

বস্তুত ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে যখন আমি মাদরাসা আলী রা.-এর ইফতার বিভাগে অধ্যয়নরত ছিলাম, তখনই পশ্চিমা ফিতনাগুলো নিয়ে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি এবং উস্তাদে মুহতারাম মুফতি বেলাল হুসাইন সাহেবের পরামর্শক্রমে একটা খসড়া তৈরি করে কাজ আরম্ভ করি। পরবর্তীকালে মাদরাসা আলী রা.-তে উস্তাদ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পর ইফতার ছাত্রদের পশ্চিমা সভ্যতা পড়ানোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় আমার কাঁধে।

তখন অনুভব করি, বাংলা, উর্দু ও আরবিতে পশ্চিমা সভ্যতা বিষয়ে অনেক ভালো বই থাকলেও আমাদের মাদরাসায় পড়তে আসা ছাত্রদের মান ও প্রয়োজনের সাথে সেগুলো পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমাদের প্রয়োজন এমন একটি বই যাতে পশ্চিমের মৌলিক মতবাদগুলোর পরিচয়, কর্মপরিধি ও ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের সাথে তার দ্বন্দের জায়গাটা সহজভাবে ফুটে উঠবে। এতে করে একজন তালেবে ইলম পশ্চিমা কুফরি মতবাদগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে এবং ফিকহের আলোকে এসব মতবাদের শরয়ি বিধান বুঝতে পারবে। অবশেষে ছাত্রজামানার পুরোনো কাজগুলো বের করি এবং উস্তাদদের পরামর্শক্রমে আরও বিস্তৃত পরিসরে কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করি।

কাজটি আমার জন্য খুব একটা সহজ ছিল না, কারণ আমার ভাষা-দুর্বলতা এত প্রকট ছিল, যা নিয়ে কাজ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তারপরও আল্লাহর ওপর ভরসা করে এগিয়ে যাই। হাতে থাকা আরবি, উর্দু, বাংলা বই, প্রবন্ধ ও ভিডিও পড়া ও দেখার চেষ্টা করি। পাশাপাশি, লিবারেলে ও সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গির বইপত্র ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ পড়তে থাকি, যাতে এসব মতবাদ ও চিন্তাধারা গোড়া থেকে বুঝতে পারি।

গত চার বছরে বইটি বারবার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছি। সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি জটিল বিষয়গুলো সহজভাবে সাজাতে, যাতে মাদরাসার তালেবে ইলম ও সাধারণ মুসলিম ভাইদের জন্য উপযোগী হয়। তবুও প্রতিবার পড়ার সময় মনে হয়েছে, এখনও কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে পারিনি—বিশেষত ভাষার সাবলীলতায় দুর্বলতা থেকেই গেছে।

অবশেষে উস্তাদে মুহতারাম নির্দেশ দিলেন, যতটুকু হয়েছে ততটুকুই প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হোক; আর সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজ চলতে থাকুক। তাঁর নির্দেশের ওপর আস্থা রেখেই বইটি দ্রুত সময়ে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি।

পাঠকদের কাছে অনুরোধ থাকবে—এই সংস্করণটিকে প্রস্তুতিমূলক সংস্করণ হিসেবে দেখবেন, ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেবেন, গঠনমূলক পরামর্শ দেবেন; যাতে আমি উপকৃত হতে পারি। আল্লাহ আমাদের সকলের জন্য কল্যাণের ফায়সালা করুন। আমিন।

দুই.

এই বইটি পড়ার আগে বা পড়ার পাশাপাশি অথবা পড়ার পর যদি নিম্নের কয়েকটি বই পড়ে নেওয়া যায়, তাহলে আশা করি পশ্চিমা সভ্যতা বিষয়ে একজন তালেবে ইলমের প্রাথমিক অজ্ঞতা কেটে যাবে :

১. *ইতিহাসের আয়নায় বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা*, হেদায়েতুল্লাহ মেহমান্দ, রুহামা পাবলিকেশন।

২. *হিউম্যান বিয়িং : শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব*, মাওলানা ইফতেখার সিফাত, সিজদাহ পাবলিকেশন।

৩. *অবাধ্যতার ইতিহাস*, ডা. শামসুল আরেফিন শক্তি, সমকালীন প্রকাশন

এ ছাড়া পশ্চিমা সভ্যতা নিয়ে আরও বিস্তারিত জানতে প্রাথমিকভাবে কী কী বই পড়া যায় সে বিষয়ে বইয়ের **পরিশিষ্ট-৩** দ্রষ্টব্য।

তিন.

এই বইয়ে পশ্চিমা সভ্যতার মৌলিক বিশ্বাস এবং মানবজীবনে তার গভীর ও বহুমুখী প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে, মূল বইয়ে যাওয়ার আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন মনে করছি।

১. বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানরা ইসলাম থেকে সরে গিয়ে জীবন পরিচালনার যে ভিন্ন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করছে—বা করতে বাধ্য হচ্ছে—তা কেবল কিছু আমলি ক্রটির ফল নয়; বরং এর পেছনে রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু আকিদা ও বিশ্বাসের গভীর প্রভাব। সেগুলো কী এবং কীভাবে কাজ করছে—তারই কিছু চিত্র এই বইতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২. সুস্থ ও বিবেকবান কোনো মানুষের পক্ষে পশ্চিমা দর্শন মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তারপরও কেন পৃথিবীর এত এত মানুষ চোখ বুজে পশ্চিমা দর্শন মেনে নিচ্ছে এবং তাকে যৌক্তিক বলে মনে করছে?

এর অন্যতম একটি কারণ হলো, পশ্চিমা দর্শনগুলো মৌলিকভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং মানুষের খাহেশাতের সাথে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা বোঝা যাক, একজন মানুষকে যদি বলা হয়, তুমি স্বাধীন। কেউ তোমাকে দাস বানিয়ে রাখতে পারবে না। তোমার জীবনের কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। কথাটি তার ভালোই লাগবে। কেননা, এই আহ্বানটি মানুষের নফস খুব সহজে মেনে নেয়। তার মনে এটা চিন্তা করতেই ভালো লাগে যে, সে সকল কিছু থেকে স্বাধীন। অথচ বাস্তবতা ও যুক্তির আলোকে এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব একটি ধারণা।

খাহেশাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়ার ফলে পশ্চিমা দর্শনগুলোকে নফস খুব সহজেই গ্রহণ করে নেয় এবং তার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি হাজির করে। আর মানুষ মনে করে, যুক্তির আলোকেই সে এই দর্শন গ্রহণ করেছে। অথচ বাস্তবতা হলো, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে সে যুক্তির দলিল মনে করে বসে আছে।

৩. পশ্চিমা মূলনীতিগুলো আসমানী বা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী প্রতিটি ধর্মের সাথেই সাংঘর্ষিক। তবুও আজ প্রায় সব ধর্মের অনুসারীরা ব্যাপকভাবে পশ্চিমের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ধর্মবিশ্বাস বজায় রেখেও তারা পশ্চিমা দর্শন গ্রহণ করেছে, একে সর্বজনীন মনে করেছে; এমনকি নিজেদের ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করতে ধর্মের মৌলিক গ্রন্থের বদলে পশ্চিমা বয়ানের আলোকে ব্যাখ্যা দিতে বেশি আগ্রহী হচ্ছে।

এর মূল কারণ হলো **রিফরমেশন**—অর্থাৎ ধর্মকে পশ্চিমা বয়ানের আলোকে সংস্কার করে নেওয়া। আর এ কাজটি পশ্চিমা সভ্যতা তার জন্মলগ্ন থেকেই গুরুত্ব সহকারে করে আসছে। মার্টিন লুথারের প্রোটেষ্ট্যান্ট আন্দোলন থেকে শুরু করে আজকের “গুড মুসলিম” প্রকল্প—সব একই সূত্রে গাঁথা।

তাই ধর্মসংস্কারের যেকোনো স্লোগান বা আন্দোলনের ব্যাপারে আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে এবং এ-জাতীয় আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রিফরমেশনের ফিতনা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

৪. রিফরমেশনের ভয়াবহতা থেকে বেঁচে থাকা অবশ্যই জরুরি। তবে ঐতিহ্য ধরে রাখার নামে যেন আমাদের ভেতর জুমুদ বা স্থবিরতা না আসে। কারণ ইসলামে তাজদিদ নামক একটি মৌলিক ধারণা আছে সেটা ভুলে গেলে চলবে না। এ ক্ষেত্রে মূল কথা সেটাই, যা কুরআন বারবার আমাদের বলেছে, কুরআন-সুন্নাহের দিকে রুজু করতে হবে।

৫. পশ্চিমা মতবাদগুলো সমাজে ছড়িয়ে পড়ার সবচেয়ে কৌশলী দিকটি হলো শব্দের খেলা। তারা তাদের মতবাদের মূল চিন্তাকে এমন কিছু শব্দ ও বাক্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়, যেগুলোর বাহ্যিক অবয়ব অধিকাংশ সাধারণ মানুষকে চমৎকৃত করে। ফলে শব্দের বাহ্যিকতার বিপরীত যেকোনো অবস্থানকে মানুষ ভালো চোখে দেখে না। ফলে শব্দের আড়ালে লুকানো কুফর সাধারণ মানুষের চোখে সহজে ধরা পড়ে না। পশ্চিমের বানানো পরিভাষাগুলো তারা অনায়াসেই গ্রহণ করে নেয়; অথচ টেরই পায় না—এসব পরিভাষার অন্তরালে লুকিয়ে আছে এমন কিছু ধারণা, যা তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ—ঈমান—ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই বিষয়ে বড় চমৎকার বলেছেন শহিদ মুফতি নিজামুদ্দিন শামযায়ী রহিমাছল্লাহ : ‘ইহুদিদের একটি চক্রান্ত হলো, তারা এমন কিছু পরিভাষা আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে যেগুলোর প্রকৃত মর্ম আমরা জানি না। আকর্ষণীয় মোড়কে আবৃত করে তারা সেগুলো আমাদের সামনে পেশ করেছে, আর আমরা বাস্তবতা না জেনে দিব্যি সেগুলো ব্যবহার করে চলছি।’

চার.

পশ্চিমা ফিতনা মুসলমানদের ঈমানের জন্য কতটা ভয়ংকর তা অনুধাবন করার জন্য দুজন আকাবিরের বক্তব্য দেখুন :

১. মাওলানা আশরাফ আলী থানভি রহিমাছল্লাহ (মৃত্যু : ১৩৬২ হি.) লেখেন, 'এই যুগে পাত্রের ঈমান-কুফরের বিষয়েও খোঁজ নেওয়া জরুরি। বর্তমানে এমন একসময় চলেছে যে, (বিয়ে-শাদিতে) হবু বর দীনদার না-কি বদকার তা দেখার আগে, বরং সে ইসলামের গণ্ডির ভেতরে আছে কি নেই, সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ, মুসলমান কনের সাথে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ছেলের ঈমান থাকা শর্ত।' অতঃপর তিনি বলেন, 'অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে যেসব পাত্রের হাতে কন্যা তুলে দেওয়া হচ্ছে, সেসব পাত্রের একটি অংশ আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে দীন ও ঈমানের সাথে কোনো রকম সম্পর্কই অবশিষ্ট রাখেনি (শুধু নামেই তারা মুসলমান রয়ে গেছে)। এদের মুখ দিয়ে কুফরি কথা বের হয় এবং ধর্মীয় বিষয়াদিকে এরা বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করে না।'^(২)

২. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাস্মীরি রহিমাছল্লাহ (মৃত্যু : ১৩৫৩ হি.) বলতেন, 'বর্তমান নবীন জেনারেল শিক্ষিতদের (অন্তরে লুক্কায়িত আকিদাগত) কুফর আমাদের জানা না-থাকার (এবং তা প্রকাশিত না-হওয়ার) কারণে আমরা তাদের মুসলমান বলি।'^(৩)

সে সময় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ কত পার্সেন্ট ছিল এবং তখনকার ধর্মীয় পরিবেশ কেমন ছিল, তা যদি এখনকার সময়ের সাথে মিলিয়ে তুলনা করা হয়, তাহলে যেকোনো ঈমানদারের অন্তরাগ্না কেঁপে উঠবে। যেকোনো ফিতনাই ফিতনা, তবে যে ফিতনা সরাসরি মানুষের ঈমান ধ্বংসের কাজ করছে, তা নিয়ে আমাদের পেরেশানি বেশি হওয়া জরুরি। অথচ দুঃখজনক হলো, পশ্চিমের এই ভয়াবহ ঈমান-বিধ্বংসী ফিতনা নিয়ে আমাদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পেরেশানি নেই।

এই বইটি লেখা এবং এই বিষয় নিয়ে কাজ করার অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো এই বিষয়ে কিছু তালেবে ইলমের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

মাদরাসার তালেবে ইলম ভাইদের প্রতি আমার আবেদন, বিশেষ করে আমার শাগরেদদের প্রতি, যারা আমার কাছে পড়েছেন বা সামনে পড়বেন—আল্লাহ

^২ ইসলামী শাদী, পৃ. ৬৮-৬৯

^৩ এই বক্তব্যটি মুফতি তাকী উসমানি দা. বা. উনার পিতা মুফতি শফি রহিমাছল্লাহর জবান থেকে সরাসরি শুনেছেন। দেখুন, আল-বালাগ, পৃ. ৫, রবিউস সানী ১৪৪৪ হি., নভেম্বর ২০২২ খ্রি.

আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীনের খেদমতের সাথে লাগিয়ে রাখুন, আমিন—আপনারা আপনাদের জীবনের বিভিন্ন ইলমি খিদমতের মধ্যে এই পশ্চিমা ফিতনার প্রতিরোধের কাজটিকেও অন্তর্ভুক্ত রাখবেন।

পাঁচ.

বহুমাত্রিক অযোগ্যতার কারণে বইটি রচনায় আমি এত বেশি মানুষের সাহায্য নিয়েছি যে, তাদের নাম উল্লেখ করে শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে গেলে পুরো পৃষ্ঠা ভরে যাবে। আল্লাহ তাদের সকলকে তাঁর শান অনুযায়ী উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

তবে দুজন মানুষের কথা না বললেই নয়। একজন হলেন ডা. শামসুল আরেফিন শক্তি ভাই। প্রচণ্ড ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি বইটি সম্পূর্ণ পড়েছেন এবং জরুরি নোট দিয়েছেন। আরও বড় কথা, বইটি প্রকাশের জন্য তাঁর জোরপূর্বক উৎসাহ আমাকে বেশ সাহস জুগিয়েছে। ভাইয়ের জন্য সর্বদা আমার একটি দোয়া, আল্লাহ ভাইকে এই আয়াত—

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

—এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিন। আমিন।

দ্বিতীয়জন হলেন উস্তাদে মুহতারাম মাওলানা আরিফুল ইসলাম সাহেব। প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব ও ব্যক্তিগত নানা ব্যস্ততার মাঝেও তিনি দীর্ঘ সময় ব্যয় করে অত্যন্ত যত্নসহকারে বইটির প্রতিটি অংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় ভাষা-সম্পাদনার মাধ্যমে বইটিকে পাঠযোগ্য করে তুলেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন অসংগতি চিহ্নিত করে দিয়েছেন, যেগুলো শনাক্ত করা হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। আল্লাহ তায়ালা উস্তাদে মুহতারাম ও তাঁর বংশধরকে উম্মাহর প্রকৃত রাহবরে দ্বীন হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

আব্দুল্লাহ বিন বশির

২৪ রবিউল আওয়াল, ১৪৪৭ হি.

১৮-০৯-২০২৫ খ্রি.

সূচিপত্র

প্রথম ভূমিকা : ঈমান ও কুফরের মৌলিক পরিচয়	২১
দ্বিতীয় ভূমিকা : দীন শব্দের মর্ম ও ব্যবহার	৩২
তৃতীয় ভূমিকা : ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতা : স্বতন্ত্র দুই জীবনদর্শন	৩৯
চতুর্থ ভূমিকা : কুরআনের আলোকে পশ্চিমা সভ্যতার বিশ্বাসের মূল্যায়ন ..	৪৮
পঞ্চম ভূমিকা : পশ্চিমা সভ্যতার গোড়ার কথা	৫০
ষষ্ঠ ভূমিকা : পশ্চিমা সভ্যতার উৎপত্তিকাল	৫৪
সপ্তম ভূমিকা : জাহিলিয়াত ও আধুনিক জাহিলিয়াত	৫৭
অষ্টম ভূমিকা : পরিভাষা বিভ্রাট	৬০
নবম ভূমিকা : পরিভাষার অঙ্গতা : পশ্চিমের ইসলামিকরণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার	৬৩

প্রথম অধ্যায়

মডার্নিজম : খোদাদ্রোহী এক জীবনদর্শন

মডার্নিজম কী?	৬৯
মডার্নিজমের ইতিহাস	৭১
রেনেসাঁ	৭৫
রিফরমেশন	৭৮
এনলাইটেনমেন্ট	৮১
বিবর্তনবাদ ও নতুন উন্মাদনা	৮৩
আধুনিকতাবাদের ভিত্তি	৮৪
১. হিউম্যানিজম (মানবতাবাদ) :	৮৪
২. যুক্তিবাদ (Rationalism) :	৯০
৩. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (individualism) :	৯৪
মডার্নিজমের বৈশিষ্ট্য	৯৪
ট্র্যাডিশন বিরোধিতা	৯৪
প্রগতিবাদ	৯৫
মুসলিম গবেষকদের নিকট মডার্নিজমের পরিচয়	৯৬
মানুষের জীবনে মডার্নিজমের প্রভাব	৯৭

মুসলিম বিশ্বে মডার্নিজম	১০১
মুসলিম মডার্নিস্টদের পরিচয়	১০১
মুসলিম মডার্নিজমের উৎপত্তি ও গোড়ার ভুল	১০৩
মুসলিম সমাজে মডার্নিজমের ধারা	১০৩
মডার্নিস্টদের ইসলামিকরণের একটি মৌলিক কৌশল	১০৫
মডার্নিজমের ইসলামিকরণের কিছু মৌলিক প্রবণতা	১০৭
মুসলিম মডার্নিস্টদের বক্তব্য দ্বারা কারা প্রভাবিত হয়?	১০৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিউম্যানিজম ও হিউম্যান রাইটস : আড়ালে থাকা সত্য

কান্ট : এনলাইটেনমেন্টের প্রধানতম দার্শনিক	১১৩
হিউম্যানিজম : এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের মৌলিক দর্শন	১১৫
হিউম্যানিজম মানবতা নয়	১১৭
হিউম্যানিজম ও আখলাক	১২০
মানবতাবাদের মূল মর্ম সকল ধর্মের মৌলিকত্বের ধ্বংসকারী	১২১
মানবাধিকার চার্টার ও তার লেখক	১২১
হিউম্যান রাইটস বাস্তবায়নের জন্য বৈশ্বিক শক্তিধরদের চাপ প্রয়োগ	১২২
কুরআন-সুন্নাহর দর্পণে হিউম্যানিজম	১২৫
যেকোনো দর্শন ও মতবাদের সঠিক পরিচয় তার বিশ্বাসের মাঝে	১২৮
বান্দার অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য	১২৯

তৃতীয় অধ্যায়

লিবারেলিজম : ধর্মকে জীবন থেকে মুছে ফেলার স্বাধীনতা

লিবারেলিজমের ইতিহাস	১৩৮
লিবারেলিজমের মূলভিত্তি	১৩৮
প্রথম ভিত্তি : স্বাধীনতা	১৩৯
স্বাধীনতার ইসলামি দৃষ্টিকোণ	১৪২
পশ্চিমা স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ : টলারেন্স	১৪৪
পশ্চিমা স্বাধীনতায় আইন তৈরির মূলনীতি : হার্ম প্রিন্সিপাল (The harm Principle)	১৪৯
দ্বিতীয় ভিত্তি : ব্যক্তিগততন্ত্রবাদ (Individualism)	১৫৩
ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগততন্ত্রবাদ	১৫৮

তৃতীয় ভিত্তি : যুক্তিবাদ	১৫৯
জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে লিবারেলিজম	১৬০
মুসলিম বিশ্বে লিবারেলিজম	১৬৩
মুসলিম বিশ্বে লিবারেলিজমকে যেভাবে প্রবেশ করানো হয়	১৬৫
লিবারেলিজমের শরয়ী বিধান	১৬৮

চতুর্থ অধ্যায়

সেক্যুলারিজম : ঈমানবিধ্বংসী মহামারি

সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা ও বাস্তবতা	১৭৬
সেক্যুলারিজম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	১৮০
বাংলা ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দের বিশ্লেষণ	১৮২
সেক্যুলারিজমের ইতিহাস	১৮৩
১. ইউরোপে খ্রিষ্টধর্ম ও সেক্যুলারিজম	১৮৩
২. রেনেসাঁ আন্দোলন ও সেক্যুলারিজম	১৮৫
৩. রিফরমেশন আন্দোলন ও সেক্যুলারিজম	১৮৭
৪. এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন ও সেক্যুলারিজম	১৮৮
৫. ফরাসি বিপ্লব ও সেক্যুলারিজম	১৮৯
স্বতন্ত্র মতবাদ হিসেবে উদ্ভব	১৯১
সেক্যুলারিজমের দর্শন	১৯২
সেক্যুলারিজমের বিভিন্ন রূপ	১৯৩
সেক্যুলারিজমের প্রকারভেদ ও প্রয়োগ	১৯৪
সেক্যুলারিজমের সম্পর্কে ভুল ধারণা	১৯৬
ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয় এই কথার প্রকৃত বাস্তবতা	১৯৬
ব্যক্তি পর্যায়ে ধর্মের পরিধিও সেক্যুলার রাষ্ট্র নির্ধারণ করে দেয়	২০০
সেক্যুলারিজম ও গণতন্ত্র	২০১
মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলারিজম	২০৩
মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলারিজম প্রসারের কারণ	২০৩
মুসলিম সেক্যুলারদের নতুন ব্যাখ্যা	২০৫
সেক্যুলারিজমের ইসলামি দৃষ্টিকোণ	২০৭
ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া	২০৮

পঞ্চম অধ্যায়

বিবর্তনবাদ : আবদ থেকে হিউম্যান বিয়িং হয়ে ওঠার মেগা প্রকল্প

সে সময়ের ইউরোপ.....	২১৭
চার্লস ডারউইনের চিন্তার পরিবর্তন	২১৮
প্রাণের উৎপত্তি থেকে বিবর্তনবাদ	২১৯
তাহলে বিবর্তনবাদ মূলত কী	২১৯
বিবর্তনবাদ কি প্রমাণিত	২২২
তত্ত্ব যখন রাজনৈতিক হাতিয়ার	২২৩
বিবর্তনবাদ কেন এত জনপ্রিয় হলো	২২৬
বিবর্তনবাদ মূল থেকেই একটি কুফরি বিশ্বাস	২২৭
পশ্চিমা সভ্যতা ও বিবর্তনবাদ	২৩০

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয়তাবাদ : জাহিলিয়াতের নতুন রূপ

জাতীয়তাবাদ কী.....	২৩৫
জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও আদর্শিক গোড়া.....	২৩৬
ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উত্থান	২৩৭
জাতীয়তাবাদ ও ইউরোপীয় উপনিবেশ	২৩৮
জাতীয়তাবাদ নিজের মাঝে যে বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করে	২৩৯
মুসলিম দেশে জাতীয়তাবাদ	২৪০
ইসলাম বনাম জাতীয়তাবাদ	২৪২
ইসলামে জাতি বিভক্তির মূলভিত্তি	২৪৩
ইসলামে গোত্র ও দেশভিত্তিক পরিচয়ের উদ্দেশ্য	২৪৪
জাতীয়তাবাদের গোড়ায় ইসলামের কুঠারাঘাত	২৪৬
জাতীয়তাবাদের অনিবার্য রূপ	২৪৭
জাতীয়তাবাদের একটি অনিবার্য রূপ হলো ধর্মহীনতা.....	২৪৯
জাতীয়তাবাদ যখন মতবাদ থেকেও বেশি কিছু.....	২৫০

অষ্টম অধ্যায়

প্রাচ্যবাদ : ধর্মের শিরোনামে অধর্মের প্রসার

প্রাচ্যবাদের পরিচয়	২৫৬
প্রাচ্যবাদের ইতিহাস	২৬০
প্রাচ্যবাদ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও প্রেরণা	২৬৬
প্রাচ্যবাদী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিভিন্ন মাধ্যম গ্রহণ	২৭২
প্রাচ্যবিদদের গবেষণা পদ্ধতি	২৭৫
প্রাচ্যবাদীদের মৌলিক ত্রুটি-বিচ্যুতি	২৭৬
প্রাচ্যবিদদের আলোচনার ক্ষেত্র	২৭৭
প্রাচ্যবাদ বিষয়ে হযরত আলী মিয়া নদভির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন	২৮৪

অষ্টম অধ্যায়

পুঁজিবাদ : একটি জীবনব্যবস্থা

পুঁজিবাদের ইতিহাস	২৮৯
পুঁজিবাদী জীবনব্যবস্থার কার্যত ভিত্তি	২৯৩
পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন	২৯৫
পুঁজিবাদের কবলে ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ	২৯৬
পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য	৩০২
পুঁজিবাদের ভুল মূল্যায়ন	৩০৫
পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী অর্থনীতি	৩০৭

পরিশিষ্ট-১

ইন্টারফেইথ : পুরান কুফর নতুন বোতলে

ইন্টারফেইথ পরিচয় ও বাস্তবতা	৩১৫
ইন্টারফেইথ শিরোনামে কুফরির সয়লাব	৩১৬
ইতিহাসের আয়নায় ইন্টারফেইথ	৩১৮
ইন্টারফেইথ ঈমানের মৌলিকত্বকে আড়াল করার এক প্রতারণামূলক প্রচেষ্টা	৩২৫
ইন্টারফেইথ ও ইন্টারফেইথ ডায়ালগ : পার্থক্য ও বাস্তবতা	৩২৬
সংলাপই যখন কুফরের দরজা খুলে দেয়	৩২৭
মুসলিমদের মাঝে ইন্টারফেইথ প্রচারের উদ্দেশ্য কী	৩২৯
ইন্টারফেইথ ও ইসলাম	৩৩১
ইন্টারফেইথের কুফরের ব্যাপারে আলেমদের ফতোয়া :	৩৩৫

পারিশিষ্ট-২

কোয়ান্টাম মেথড : ঈমান হরণের নতুন কৌশল

কোয়ান্টাম মেথড পরিচিতি.....	৩৪৫
কোয়ান্টাম মেথডের প্রতিষ্ঠাতা ও ইতিহাস.....	৩৪৬
কোয়ান্টাম মেথডের মৌলিক কুফরি.....	৩৪৯
প্রথম কুফরি : মনপূজা.....	৩৫০
দ্বিতীয় কুফরি : ইন্টারফেইথ তথা আস্তঃধর্মের প্রচার.....	৩৫৪
একটি ভ্রান্ত আপত্তি ও তার জবাব.....	৩৫৮

পারিশিষ্ট-৩

পশ্চিমা সভ্যতা সংক্রান্ত কিছু বইয়ের তালিকা

মৌলিকভাবে পশ্চিমা সভ্যতা.....	৩৬০
মডার্নিজম ও মুসলিম মডার্নিজম.....	৩৬২
লিবারেলিজম.....	৩৬৩
সেক্যুলারিজম.....	৩৬৩
বিবর্তনবাদ.....	৩৬৪
বিজ্ঞানবাদ.....	৩৬৪
জাতীয়তাবাদ.....	৩৬৫
প্রাচ্যবাদ.....	৩৬৫
পুঁজিবাদ.....	৩৬৬
ইন্টারফেইথ.....	৩৬৭
কোয়ান্টাম মেথড.....	৩৬৭
পশ্চিমা সভ্যতা থেকে তৈরি হওয়া বিভিন্ন সংশয় খণ্ডন.....	৩৬৭

दृष्यवग

প্রথম ভূমিকা

ঈমান ও কুফরের মৌলিক পরিচয়

ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতা—বস্তুত এ-দুয়ের মাঝে ঈমান ও কুফরের সম্পর্ক। একটি ঈমান ও অপরটি কুফর। একটি জাহান্নামের পথ আর অপরটি জাহান্নামের পথ। একটি শিক্ষা দেয় কীভাবে আল্লাহকে বন্ধু বানাতে হবে। আর অপরটি শিক্ষা দেয় কীভাবে শয়তান ও নফসকে বন্ধু বানাতে হবে। বইতে আলোচিত পশ্চিমা সভ্যতার কুফরিগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য ঈমান ও কুফরের মৌলিক পরিচয় ও শর্তগুলো সংক্ষিপ্তভাবে হলেও জেনে রাখা জরুরি। যাতে পশ্চিমা সভ্যতার মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসগুলো পড়ার সময় ঈমানের সাথে তার বিরোধগুলো সহজেই চিহ্নিত করে নেওয়া যায়।

১। ঈমানের পরিচয়

আল্লাহ তাফতাজানি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৯২ হি.) বলেন,

اعلم أن الإيمان في الشرع: (هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى) أي تصديق النبي عليه السلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى إجمالاً. (المواقف ৩/৫২৭, المقصد الأول: في حقيقة الإيمان)

‘শরিয়তের পরিভাষায় ঈমান হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা “তাসদিক” (সত্যায়ন) করা। অর্থাৎ, যেসব বিষয় তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন বলে সুনিশ্চিতভাবে জানা যায়, তার সবকিছুকে আন্তরিকতার সাথে সামগ্রিকভাবে^(৪) সত্যায়ন করা।’^(৫)

^৪ অর্থাৎ, সত্যায়িত প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে সত্যায়ন করা আবশ্যিক নয়।

^৫ আল-মাওয়াযিফ : ৩/৫২৭

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘তাসদিক’ করা

শরিয়তের দৃষ্টিতে ‘তাসদিক’ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তিনটি বিষয় আবশ্যিক :

ক. অন্তরে সুনিশ্চিত জ্ঞান রাখা।

খ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যবাদী জানা।

গ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত যাবতীয় বিষয় মনেপ্রাণে মেনে নেওয়া।

আল্লামা তাফতাজানী রহিমাছুল্লাহ লেখেন,

الإيمان في اللغة: التصديق، أي إذعان حكم المخبر وقبوله وجعله صادقا. (شرح العقائد النسفية ص ٦٩)

“‘তাসদিক’ হচ্ছে, সংবাদদাতা (তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল)-এর বিধানের সামনে **আনুগত্য প্রদর্শন করা**, তা গ্রহণ করে নেওয়া এবং তা সত্যে পরিণত করা।’^(৬)

সুতরাং শুধু মৌখিকভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্যায়ন করা অথবা তারা সত্যবাদী এটুকু বিশ্বাস করার দ্বারা ‘তাসদিক’ হবে না।

তাফতাজানী রহিমাছুল্লাহ লেখেন,

ليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان وقبول، بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم على ما صرح به الإمام الغزالي. (المواقف ٥٢٧/٣، المقصد الأول: في حقيقة الإيمان)

“‘তাসদিকের’ তত্ত্বকথা এ নয় যে, আনুগত্য গ্রহণ ও বরণ ব্যতিরেকে শুধু অন্তরে সংবাদ (কুরআন-সুন্নাহ) বা সংবাদদাতা (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল)-এর দিকে সত্যতার সম্পর্ক তৈরি হওয়া; বরং “‘তাসদিক’ হলো সত্যায়িত বিষয়ের আনুগত্য বরণ করা এবং তা এমনভাবে গ্রহণ করে নেওয়া, যার ব্যাপারে “আত্মসমর্পণ” শব্দ প্রয়োগ করা যায়, যেমনটা ইমাম গাজালী রহ. স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।’^(৭)

^৬ শরহুল আকযিদিন নাসাফিয়্যাহ, পৃ. ৬৯

^৭ আল-মাওয়াকিফ : ৩/৫২৭

২. সুনিশ্চিতভাবে জানা

এর দ্বারা সেসব বিষয় বুঝানো হয়েছে যেগুলো এতটাই ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, সাধারণ ও অসাধারণ সবাই তা দ্বীনি আকিদা বা বিধানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি জানে। এ-ধরনের সব বিষয়ের তাসদিক করা এবং এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমান আনয়নের জন্য অপরিহার্য। শরিয়তের পরিভাষায় এগুলোকে ‘জরুরিয়াতে দ্বীন’ বলা হয়। কেউ যদি এমন কোনো বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে বা সত্যায়ন করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে সে মুমিন বলে বিবেচিত হবে না। কারণ, জরুরিয়াতে দ্বীনের তাসদিক ছাড়া কারও ঈমান গ্রহণীয় হয় না। আল্লামা তাফতাজানী রহিমাতুল্লাহ লেখেন,

تصديق النبي فيما علم بحيثه به ضرورة أي فيما اشتهر كونه من الدين بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال، كوحدة الصانع ووجوب الصلاة وحرمة الخمر وغير ذلك. (شرح المقاصد في علم الكلام ২/২৭৭)

‘যা কিছুসহ রাসুলের আগমন সুনিশ্চিতভাবে জানা গেছে, সেসব বিষয়ে তাকে সত্যায়ন করা। অর্থাৎ, সেসব ব্যাপারে, যেগুলো দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি এতটাই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, সাধারণ জনতাও তা জানে। এর জন্য আলাদা গবেষণা ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন হয় না। যেমন, আল্লাহর একত্ববাদ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মুসলমানের ওপর ফরজ ও মদ ইসলামে হারাম ইত্যাদি।’^(৮)

২। দ্বীনের মৌলিক ভিত্তি

ঈমানের সংজ্ঞায় আমরা দেখেছি, দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত সব বিষয়, বিশেষত জরুরিয়াতে দ্বীন বা দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়সমূহকে সত্যায়ন করা ঈমানের অপরিহার্য অংশ। তবে এর মধ্যে কিছু বিষয় এমন রয়েছে যেগুলো একদম মৌলিক পর্যায়ে, যেগুলোর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া ‘ঈমান’ ঈমান হিসেবে ধর্তব্যই হয় না। কুরআন ও হাদিসে এই মৌলিক বিষয়গুলো বারবার আলোচিত হয়েছে।

মৌলিক সে বিষয়গুলো মোট ছয়টি। গুরুত্ব বিবেচনায় এগুলোকে উসুলুত দ্বীন বা আরকানুল ঈমানও বলা হয়। ইমাম তহাবী রহিমাতুল্লাহ লেখেন,

الإيمان: هو الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره

^৮ শরহুল মাকাসেদ : ২/২৪৭

وشره، وحلوه ومرة من الله تعالى. (متن الطحاوي بتعليق الألباني ص ٦٤)

‘ঈমান হলো আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং তাকদিরের ভালো ও মন্দ, মিষ্ট ও তিক্ত সব আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটে থাকে—এর প্রতি বিশ্বাস রাখা।’^(৯)

এক. আল্লাহর প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমানের সারকথা হলো, আল্লাহ তাআলা একক সত্তা। তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁর সদৃশ কিছুই নেই। কোনো কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে বা ঠেকাতে পারবে না এবং তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি সূচনাবিহীন অনাদি এবং সমাপ্তিহীন অনন্ত। তিনি নিঃশেষ হবেন না এবং তাঁর কোনো ক্ষয় নেই। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই ঘটে না। মানবীয় কোনো কল্পনা তাঁর নাগাল পায় না। কোনো অনুমান ও বোধবুদ্ধিও তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। কোনো সৃষ্টজীব তাঁর সদৃশ নয়। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই। তিনি চির জাগ্রত, কখনো ঘুমান না। তিনি সমস্ত প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তিনি সৃষ্টিকর্তা, অক্লান্ত রিষিকদাতা। নির্ভয়ে প্রাণ হরণকারী এবং বিনা কষ্টে পুনরুত্থানকারী।

সৃষ্টির বহু আগ থেকেই তিনি স্বীয় গুণাবলিসহ শাস্ত্রত সত্তা হিসেবে বিদ্যমান আছেন। পরবর্তী সময়ে সৃষ্টির অস্তিত্বের কারণে তাঁর গুণাবলির মধ্যে এমন কোনো গুণ বৃদ্ধি পায়নি, যা মাখলুক সৃষ্টির আগে ছিল না। তিনি স্বীয় গুণাবলিসহ যেমন অনাদি ছিলেন, সেভাবেই স্বীয় গুণাবলিসহ অনন্তকাল থাকবেন।

তিনি সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান, আর সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং সবকিছু তাঁর জন্য সহজ। তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

তিনি স্বজ্ঞানে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন সবকিছুর পরিমাণ, এবং তাদের হায়াতের সময়সীমাও নির্ধারণ করেছেন।

মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন বা অস্পষ্ট ছিল না। সৃষ্টির পূর্বেই মাখলুকের পরবর্তী কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত ছিলেন।

আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুককে তাঁর আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেছেন।

সবকিছুই তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় পরিচালিত হয়, সবকিছু কার্যকর হয় তাঁর

^৯ আল-আকিদাতুত তহাবিয়াহ

ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া বান্দার ইচ্ছায় কিছুই কার্যকর হয় না। সুতরাং তিনি বান্দার জন্য যা চান তা-ই হয়, আর যা চান না তা হয় না।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে যাকে ইচ্ছা হেদায়েত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা ন্যায়ভাবে পথভ্রষ্ট, অপমানিত ও বিপদগ্রস্ত করেন (পরীক্ষায় ফেলেন)। সবাই তাঁর ইচ্ছার অধীনে তাঁর অনুগ্রহ ও ন্যায়বিচারের মাঝে আবর্তিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই। তাঁর হুকুমকে বাতিল করার কেউ নেই এবং তাঁর আদেশের ওপর প্রভাব বিস্তারকারীও কেউ নেই। আল্লাহ তাআলা সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষের উর্ধ্বে।

এককথায়, আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য যত গুণাবলি নির্ধারণ করেছেন, এবং যেভাবে করেছেন সেগুলোকে দিল থেকে তাসদিক (ঈমানের পরিচয়ে বলা শর্তসহ) করাই হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

দুই. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

এই কথা বিশ্বাস করা যে, ফেরেশতারা নূরের সৃষ্টি বিশেষ ধরনের মাখলুক। তারা আল্লাহ কর্তৃক বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। তাদের কিছু কাজ হলো : আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে হিফাজত করা, মানুষের আমলের হিসাব রাখা, ওহী নিয়ে অবতরণ করা, প্রাণ সংহার করা, বৃষ্টি বর্ষণ করা, চাঁদ ও সূর্যের উদয়-অস্ত নিয়ন্ত্রণ করা—এককথায়, কুরআন-হাদিসে তাদের যেসব গুণ ও কর্ম বিবৃত হয়েছে, সেসব গুণে তারা সর্বদা গুণাঙ্ঘিত এবং সেসব কাজে তারা সর্বদা নিয়োজিত, এই বিশ্বাস রাখা ঈমানের অপরিহার্য অংশ। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রেখেছেন, তাদের প্রতি কোনো মুখাপেক্ষিতা ছাড়াই। এর পেছনে আল্লাহর বিশেষ কোনো হিকমাহ ও অন্তর্নিহিত রহস্য রয়েছে, যে বিষয়ে তিনিই সর্বাধিক অবগত।

যেহেতু ফেরেশতারা দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তাই তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে যেটুকু প্রমাণিত সেটুকুর ওপরই ঈমান রাখা আবশ্যিক।

তিন. কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তায়ালা নবী ও রাসূলগণের প্রতি যত কিতাব ও সহিফা অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তাওরাত, জাবুর ইঞ্জিল, কুরআন ও সহিফাসমূহ—সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এই আকিদা অন্তরে রাখতে হবে। তবে সাথে এই বিশ্বাসও রাখতে হবে, কুরআনের পূর্বে যত

কিতাব আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন সবগুলো বিকৃত হয়ে গিয়েছে, শুধু কুরআনকেই আল্লাহ নিজ দায়িত্বে রক্ষা করেছেন। কুরআন পূর্বের সকল কিতাবকে রহিত করে দিয়েছে। বর্তমানে নাজাতের একমাত্র পথ হলো কুরআনের নির্দেশ মতে জীবনকে পরিচালনা করা।

চার. নবীগণের প্রতি ঈমান

নবী অর্থ সংবাদদাতা। রাসূল অর্থ দূত ও বার্তাবাহক। পরিভাষায় নবী ও রাসূল বলা হয় সে সকল মহান ব্যক্তিকে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছে বিধিবিধান পৌঁছানোর জন্য যাদের নির্বাচন করেছেন। আদম আ. থেকে শুরু করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত অসংখ্য-অগণিত নবী-রাসূল আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তাদের প্রকৃত সংখ্যা কত ছিল তা আল্লাহই ভালো জানেন। ঈমানের জন্য জরুরি হলো, তাদের সংখ্যা যাই হোক, তারা সবাই হকের ওপর ছিলেন। মানবজাতির মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উত্তম গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। মানুষের জন্য ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে নবীগণের মধ্যে পার্থক্য করা জায়েয নেই যে, কোনো নবীর ওপর ঈমান আনবে আর কোনো নবীকে অস্বীকার করবে।

পাঁচ. শেষ দিবসের প্রতি ঈমান

এই আকিদা রাখা যে, এই দুনিয়ায় কেউ চিরকাল থাকবে না। একদিন গোটা বিশ্বজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে, যে দিনকে কেয়ামত দিবস বলা হয়। সে সময় প্রাণবিশিষ্ট সকল প্রাণীর ওপর মৃত্যু আরোপিত হবে। আবার মৃত্যুর পর নির্ধারিত সময়ে সবাই পুনরুজ্জীবিত হবে। এরপর আল্লাহ প্রত্যেকের ঈমান ও আমলের হিসাব নেবেন। তারপর জান্নাতীদের জান্নাতে এবং জাহান্নামীদের জাহান্নামে ছুড়ে ফেলবেন।

ছয়. তাকদিরের প্রতি ঈমান

তাকদিরের ব্যাপারে এই বিশ্বাস রাখা আবশ্যিক যে, দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে, চাই মানুষের সাথে হোক বা অন্যান্য বস্তুর সাথে, সকল বিষয় আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ীই হয়। কোনো কিছুই আল্লাহর ইচ্ছার বাহিরে নয়। আল্লাহ যেমন আমাদের সৃষ্টি করেছেন এমনি আমাদের কাজসমূহকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কর্মের একটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, যার মাধ্যমে তারা তাদের ইচ্ছামতো যেকোনো কাজ করতে পারে। আর এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে কৃত কাজের ওপরই তার হিসাব হবে।

৩। ঈমানের শর্তসমূহ

ঈমানের পরিচয় অংশে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মৌলিকভাবে ঈমান হলো ‘তাসদিক বিল ক্বলব’ (আন্তরিক সত্যায়ন)-এর নাম। কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য মৌলিক কিছু শর্ত রয়েছে, যেগুলো ছাড়া ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। এসব শর্তাবলির কোনো একটি শর্ত যদি কারও মধ্যে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তাহলে সে মুমিন বলে গণ্য হবে না। ইমাম মাতুরিদি রহিমাতুল্লাহ লেখেন,

إن كان رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر. (شرح الفقه الأكبر ص ৫৬৭، قديمي كتب خانه، كراتشي)

অর্থাৎ, ঈমানের অপরিহার্য কোনো একটি শর্ত প্রত্যাখ্যানই হলো কুফর।^(১০)

ঈমানের মৌলিক শর্ত পাঁচটি :

১. মৌখিক স্বীকারোক্তি—الإقرار باللسان

অনেক মুহাক্কিক আলেম ঈমানের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে তাসদিকের (আন্তরিক সত্যায়ন) পাশাপাশি মৌখিক স্বীকারোক্তির কথাও সংজ্ঞায় উল্লেখ করেছেন। তাদের সংজ্ঞানুসারে কেউ যদি তাসদিকের পাশাপাশি মৌখিক স্বীকারোক্তি দেয় তাহলেই কেবল সে মুমিন বলে বিবেচিত হবে; অন্যথায় সে কাফির বলে ধর্তব্য হবে।

তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে মৌখিক স্বীকারোক্তি ঈমানের মূল হাকিকতের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং ঈমানের মূল হলো ‘তাসদিক বিল ক্বলব’ (আন্তরিক সত্যায়ন)। আর মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রয়োজন হয় ব্যক্তির ওপর ইসলামের বিধিবিধান প্রয়োগ করার জন্য। ইমাম আবুল মুয়ীন আন-নাসাফী রহিমাতুল্লাহ বলেন,

وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، فمن أتى بهذا التصديق فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار يحتاج إليه ليقف عليه الخلق، فيجروا عليه أحكام الإسلام. هذا هو المروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وإليه ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله، وهو أصح الروايتين عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله. (التمهيد لقواعد التوحيد ص ৩৭৮)

^{১০} শরহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২৪৯

‘সুতরাং ঈমান হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা তাসদিক করা। যে ব্যক্তি তা তাসদিক করবে, সে আল্লাহর কাছে মুমিন বলে বিবেচিত হবে। আর মৌখিক স্বীকারোক্তির প্রয়োজন এ কারণে যে, মানুষ যেন তার ঈমানের ব্যাপারে অবগত হয়ে তার ওপর ইসলামের বিধিবিধান প্রয়োগ করতে পারে। এটিই ইমাম আবু হানিফা রহিমাছল্লাহের মত। আবু মানসুর মাতুরিদি রহিমাছল্লাহও এই মত পোষণ করেছেন। আর আবুল হাসান আশআরী রহিমাছল্লাহের দুটি মতের মধ্যে এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত।’^(১১)

তবে উভয় দল এই ব্যাপারে একমত যে, কারও থেকে মৌখিক স্বীকারোক্তি তলব করা হলে তার জন্য মৌখিক স্বীকারোক্তি দেওয়া অপরিহার্য। যদি তলব করা সত্ত্বেও বিনা ওজরে কেউ মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদান থেকে বিরত থাকে, তাহলে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে।

২। সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা—الرضا والمحبة

একজন মুমিনের জন্য ইসলামের সকল বিধান ও সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্টি পোষণ করা এবং সেগুলোর প্রতি মুহাব্বত ও ভালোবাসা লালন করা অপরিহার্য। শরিয়তের দৃষ্টিতে কারও ঈমান বিবেচ্য হতে হলে শর্ত হলো শরিয়ত ও ইসলামের প্রমাণিত প্রতিটি বিষয়কে সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে দেখা এবং সেগুলোর সাথে হৃদয়তা ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখা। কেউ যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে সত্যায়ন করে, মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকারোক্তিও প্রদান করে, কিন্তু ইসলামি শরিয়তের প্রতি অন্তরে বিরূপ মনোভাব লালন করে কিংবা ইসলামের প্রমাণিত কোনো একটি বিষয়কে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে, তাহলে সে ব্যক্তি মুমিন বলে বিবেচিত হবে না, কাফের বলেই ধর্তব্য হবে।

৩। সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ—التعظيم والاحترام

ঈমান বিবেচ্য হওয়ার জন্য এটি একটি মৌলিক শর্ত। কেউ যদি পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে সত্যায়ন করে এবং মৌখিক স্বীকারোক্তিও প্রদান করে, তবে ইসলামের প্রতি কিংবা ইসলামের প্রমাণিত কোনো একটি বিষয়ের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ লালন না করে; বরং ইসলামকে অবমাননা করে বা ইসলামের প্রমাণিত কোনো একটি বিধানকে অবমাননা করে, তাহলে তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। সে মুমিন বলে বিবেচিত হবে না।

^{১১} আত-তামহীদ লি কাওয়ায়িদিত তাওহীদ, পৃ. ৩৭৮

৪। আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য—التسليم والانقياد

আত্মসমর্পণের অর্থ হচ্ছে সকল শর্ত ও হাকিকত ঠিক রেখে ঈমান আনার পর গোটা শরিয়তের প্রতিটি বিধানের সামনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেওয়া এবং তার ওপর আমলের জযবা ও মানসিকতা রাখা। কুরআনে আল্লাহ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, শরিয়তের প্রতিটি বিধান ও ফায়সালার সামনে নিজেকে সমর্পণ করা ব্যতীত ঈমানের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

অতএব, আপনার রবের কসম! ওরা মুমিন হবে না যতক্ষণ না ওরা নিজেদের মধ্যে সংঘটিত বিবাদে ক্ষেত্রে আপনাকেই বিচারক বানাবে। অতঃপর আপনার ফায়সালা সম্বন্ধে নিজেদের মনে কোনো সংকীর্ণতা বোধ করবে না এবং (তা) সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবে।^(১২)

ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসিরে লেখেন,

وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم؛ لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان. (أحكام القرآن ٢/٢٦٨، تحت سورة النساء، الآية: ٦٥)

‘এই আয়াতে এ পথনির্দেশনা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কোনো বিধান অথবা রাসুলের কোনো হুকুম প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। সে সন্দেহবশত তা প্রত্যাখ্যান করুক অথবা গ্রহণ না করতে পারার কারণে প্রত্যাখ্যান করুক কিংবা আত্মসমর্পণ থেকে বিরত থাকার কারণে প্রত্যাখ্যান করুক—এ সবই সমান। ... কেননা আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, যারা রাসুলের সিদ্ধান্ত ও ফায়সালার সামনে আত্মসমর্পণ করে না, তারা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত নয়।’^(১৩)

^{১২} সূরা নিসা : ৬৫

^{১৩} আহকামুল কুরআন : ২/২৬৮

৫. ইসলাম ছাড়া সকল ধর্ম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা—التبري عن الأديان سوى الإسلام

ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শুধু ইসলামের ব্যাপারে আন্তরিক সত্যায়ন, মৌখিক স্বীকারোক্তি, সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা, আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম ও কুফরি-শিরকি মতবাদ ও মতাদর্শের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাও মৌলিক ও অপরিহার্য শর্ত। সুতরাং কেউ নিজেকে যতই মুসলিম বলে দাবি করুক না কেন, সে যদি হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, ইহুদি ধর্ম কিংবা স্পষ্ট কোনো কুফরি মতবাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করে তাহলে তার ঈমান বিশুদ্ধ হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র দীন হলো ইসলাম।

আল্লামা হাসকাফি রহিমাতুল্লাহ (মৃত্যু : ১০৮৮ হি.) বলেন,

(وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان) سوى الإسلام (أو عما انتقل إليه) بعد نطقه بالشهادتين، وتماحه في الفتح؛ ولو أتى بهما على وجه العادة لم ينفعه ما لم يتبرأ. حاشية ابن عابدين ١٩/١٣، كتاب الجهاد باب المرتد، تـ صالح الفرفور)

‘মুরতাদ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের পন্থা হলো, সে তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার পরে ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্মের সঙ্গে কিংবা ইসলাম ছেড়ে যে ধর্মে সে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সে যদি শুধু তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য দেয়, তাহলে এটা তার কাজে আসবে না—যতক্ষণ না সেগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।’^(১৪)

৪। কুফরের পরিচয়

কুফরের পরিচয় ও সংজ্ঞা একেক গবেষক একেক শব্দে ও আন্দাজে পেশ করেন। তবে কুফরের সবচেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক সংজ্ঞা হলো,

عدم الإيمان عما من شأنه. (شرح المقاصد ٤٥٧/٣، المقصد السادس: في تعريف الكفر)

‘সেসব বিষয়ের ওপর ঈমান আনা অপরিহার্য তার ওপর ঈমান না আনা।’^(১৫)

কাজি আজদুদ্দিন রহিমাতুল্লাহ কুফরের ব্যাপারে বলেন,

^{১৪} ফাতাওয়ায়ে শামী : ১৩/১৯

^{১৫} শরহুল মাকাসেদ : ৩/৪৫৭

فهو عندنا عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه به ضرورة. (شرح الموافق ٣٦١/٨، المقصد الثالث: في الكفر)

‘আমাদের কাছে কুফরের সংজ্ঞা হলো, যেসব বিষয়সহ রাসুলের আগমন সুনিশ্চিতভাবে জানা গেছে, এমন কোনো বিষয়ে সত্যায়ন না করা।’^(১৬)

অপর একটি গ্রন্থে তিনি অল্প কথায় ব্যাপক অর্থবোধক করে কুফরের পরিচয় এভাবে উল্লেখ করেছেন,

الكفر عدم الإيمان.

‘কুফর হচ্ছে ঈমান না আনা।’^(১৭)

এ সকল সংজ্ঞা থেকে এটা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি শরিয়ত স্বীকার করে না, আবার অস্বীকারও করে না, সে কাফের বলে বিবেচিত হবে। কারণ, ঈমানের ভিত্তি হলো সত্যায়নের ওপর, কিন্তু তার থেকে সত্যায়ন পাওয়া যায়নি, তাই তাকে মুসলমান বলা হবে না।^(১৮)



^{১৬} শরহুল মাওয়াকফ : ৮/৩৬১

^{১৭} শরহুল আকায়েদিল আজদিয়াহ, পৃ. ১০৮

^{১৮} ঈমান ও কুফরের এই পুরো আলোচনা কিছুটা সংযোজন ও সংক্ষেপণের সাথে মুফতি উবাইদুর রহমান মারদান হাফিজাহুল্লাহ রচিত *উসুলুত তাকফির* ও মাওলানা আলী হাসান উসামা রচিত *কুফর ও তাকফির* গ্রন্থদ্বয় থেকে নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় ভূমিকা

দ্বীন শব্দের মর্ম ও ব্যবহার^(১৯)

দ্বীন শব্দের শাব্দিক বিশ্লেষণ

আরবি ‘দানা’ (دان) শব্দটি প্রাচীন সেমিটিক ভাষাসমূহের একটি যৌথ শব্দ। অধিকাংশ সেমিটিক ভাষায় এই শব্দটি শাসন ও বিচার অর্থে এসেছে।

আরবি ও প্রাচীন হিব্রু ভাষায় শব্দটির অর্থ ‘পরিশোধযোগ্য ঋণ’। অথবা এর অর্থ এমন বাধ্যতামূলক নির্দেশনা, যা অনুসূতের পক্ষ থেকে অনুসারীর প্রতি হয়ে থাকে; যেন সে তার সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করত নত হয়ে থাকে।^(২০)

প্রাচীন আরবি অভিধানে এই শব্দটির অর্থ আরও বেশি সম্পৃক্ত ছিল ‘বিনয়ের সাথে উচ্চপদস্থের প্রতি অধস্তনের আনুগত্য ও অনুগমন’ অর্থের সাথে। ইবনু ফারিস রহিমাছল্লাহ (মৃত্যু : ৩৫৯ হি.) বলেন,

الدَّالُّ وَالنِّبَاءُ وَالْثَوْنُ أَصْلٌ وَاحِدٌ إِلَيْهِ يَرْجِعُ فُرُوعُهُ كُلُّهَا. وَهُوَ جِنْسٌ مِنَ الْإِثْقَادِ. (معجم

مقاييس اللغة ৩/৩১৭, تحت كتاب الدال، مادة دين، ت عبد السلام محمد هارون)

দাল, ইয়া, নুন—এই ধাতু থেকে রূপান্তরিত সকল শব্দের মৌলিক অর্থ একটি। আর তা হলো আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা।^(২১)

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ দাররায রহিমাছল্লাহ (মৃত্যু : ১৩৭৭ হি.) দ্বীন শব্দের আভিধানিক অর্থগুলো গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছেন। তার মতে দ্বীন শব্দের সকল অর্থ মৌলিক তিনটি অর্থের মাঝেই আবর্তিত হয়—

১. যদি শব্দটি (Verb) সরাসরি মাফউলের (Object) সাথে ব্যবহৃত হয়,

^{১৯} আলোচনাটি নেওয়া হয়েছে তিউনিসিয়ার বিখ্যাত গবেষক ড. সামি আমেরি রচিত *আল-আলামানিয়াহ : তাউলু আসর গ্রন্থের* ২২২-২২৭ পৃ. থেকে, কিছুটা সংক্ষেপ করে।

^{২০} See B. Lewis et al., eds., *The Encyclopedia of Islam*, Leiden: Brill 1991, 2/293

^{২১} মাকায়িসুল লুগাহ, ২/৩১৯

যেমন : **ادنه ديناً**, তাহলে এর অর্থ হবে, সে তার মালিক হয়েছে, তাকে শাসন করেছে, তাকে পরিচালনা করেছে, তাকে বাধ্য করেছে, তার হিসাব নিয়েছে, তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, তাকে প্রতিদান দিয়েছে, তাকে পুরস্কার দিয়েছে। এই সবগুলো অর্থ মৌলিক একটি অর্থে আবর্তিত হয়—মালিকানা-কর্তৃত্ব-হস্তক্ষেপাধিকার; যা মূলত শাসক বা রাজাদের কাজের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : রাজনীতি ও প্রশাসন, বিচার ও দমন, জবাবদিহি ও প্রতিদান।

২. যদি শব্দটি (Verb) সরাসরি মাফউলের (Object) সাথে ব্যবহার না হয়, বরং ‘লাম’ অব্যয়যোগে ব্যবহৃত হয়, যেমন : **ادان له**, তাহলে এর অর্থ হবে, সে তার আনুগত্য করেছে, তার সামনে নত হয়েছে। এখানে দীন অর্থ আনুগত্য ও বাধ্যতা, ইবাদত ও তাকওয়া। এই অর্থটি পূর্বোক্ত অর্থের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন, আরবরা বলত, **ادان فداى له** : সে তাকে আনুগত্যের জন্য বাধ্য করল, ফলে সে নত হলো এবং আনুগত্য মেনে নিল।

৩. যদি শব্দটি (Verb) সরাসরি মাফউলের (Object) সাথে ব্যবহার না হয়, বরং ‘বা’ অব্যয়যোগে ব্যবহৃত হয়, যেমন : **دان بالشئ**, তাহলে এর অর্থ হবে, সে বিষয়টিকে দীন ও মাজহাব হিসেবে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ সে সেটাকে বিশ্বাস করেছে, তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে অথবা তা চরিত্রে ধারণ করেছে। এই দিক থেকে দীন শব্দের অর্থ দাঁড়ায়, এমন পথ ও পন্থা যা মানুষ চিন্তায় ধারণ করে এবং কার্যত বাস্তবায়ন করে।

সুতরাং কার্যত দিক থেকে : প্রতিটি মানুষের দীন হলো তার অভ্যাস, চরিত্র ও জীবনযাত্রা। যেমন আরবরা বলত, **هذا ديني ودينى** : এটাই আমার দীন, এটাই আমার অভ্যাস। আর চিন্তাগত দিক থেকে : একজন মানুষের দীন হলো তার আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-অভিমত, যা সে অন্তরে লালন করে।^(২২)

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ দাররায রহ. পুরো আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন এভাবে—মোটকথা, আরবদের নিকট দীন শব্দটি দুই পক্ষের মধ্যকার সম্পর্ক বোঝায়, যেখানে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে মহান মনে করে এবং তার প্রতি বিনয় প্রকাশ করে। যদি শব্দটি প্রথম পক্ষের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে অর্থ দাঁড়ায়—বিনয় ও আনুগত্য; আর যদি দ্বিতীয় পক্ষের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে অর্থ দাঁড়ায়—নির্দেশ ও কর্তৃত্ব, শাসন ও বাধ্যবাধকতা। আর যদি উভয় পক্ষের মাঝে

^{২২} আদ-দীন : বুখসুন মুমাহহাদাতুন লিদারাসাতি তারিখিল আদযান, পৃ. ৩০-৩১, দারুল কলম

মেলবন্ধনকারী সম্পর্কের দিকে লক্ষ করা হয়, তবে দ্বীন অর্থ হয়—উক্ত সম্পর্ককে সুসংহতকারী নীতিমালা অথবা ওই পরিবেশ যা উক্ত সম্পর্ককে প্রকাশ করে।

অতএব আমরা বলতে পারি, দ্বীন শব্দের প্রতিটি ব্যবহারই ‘আনুগত্যের অপরিহার্যতা’ (لزوم الانقياد) অর্থের মাঝে আবর্তিত হয়। প্রথম ব্যবহারে দ্বীন শব্দের অর্থ হয়—আনুগত্য গ্রহণে বাধ্য করা (الإلزام الانقياد); দ্বিতীয় ব্যবহারে অর্থ হয়—আনুগত্যকে নিজের ওপর অপরিহার্য করে নেওয়া (التزام الانقياد) এবং তৃতীয় ব্যবহারে অর্থ হয়—ওই নীতিমালা যার অনুগত হওয়া আবশ্যিক (المبدأ الذي يُلتزم الانقياد له)^(২৩)

কুরআনের পরিভাষায় দ্বীন

সালাফের উত্তরাধিকার হিসেবে আমরা দ্বীনের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যে সংজ্ঞাটি পেয়েছি তা হলো—‘ইলাহ কর্তৃক প্রণীত এমন ব্যবস্থা যা বুদ্ধিমান মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক; তারা স্বেচ্ছায় এটি বেছে নিয়ে বর্তমান জীবনে কল্যাণের পথে চলে এবং পরকালে সফল হয়।’^(২৪)

সংজ্ঞাটি যদিও বেশ প্রসিদ্ধ, কিন্তু অসম্পূর্ণ; ‘দ্বীন’ শব্দের প্রকৃত মর্ম এর থেকে উদ্ঘাটন করা যায় না। এর প্রধান কারণ হলো, এটি আসলে ‘দ্বীন’-এর সংজ্ঞা নয়, বরং ‘দ্বীনে হক’ তথা ‘সত্য দ্বীন’-এর সংজ্ঞা। ‘দ্বীন’ ও ‘সত্য দ্বীন’-এর মধ্যে পার্থক্য হলো, ‘দ্বীন’ একটি জিনস (الجنس / Genus), আর ‘সত্য দ্বীন’ হলো তার একটি নাও (النوع / Species)।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের প্রেক্ষাপট ও বর্ণনামূলক থেকেও এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বীন শব্দটি হক ও বাতিল উভয় প্রকার দ্বীনকেই অন্তর্ভুক্ত করে এবং মানুষও উভয় প্রকার দ্বীনই গ্রহণ ও অনুসরণ করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান,

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

^{২৩} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

^{২৪} পাকিস্তানের বিখ্যাত আলেম ও ফকিহ মুফতি উবাইদুর রহমান মারদান হাফিজাছল্লাহ ও এমন মতই ব্যক্ত করেছেন—ইলমে কালামের কিতাবসমূহে দ্বীন শব্দের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা একটি নির্দিষ্ট অর্থের দিকে লক্ষ করে দেওয়া হয়েছে। দেখুন নেজামে যিন্দেগী ম্যে দ্বীন ও মাজহাব কা হাকিকি কদর ও মাকাম, পৃ. ২৫

আর যে-কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ থেকে তা মোটেই গ্রহণ করা হবে না। আর সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।^(২৫)

এখানে ইসলামকে যেরূপ দীন বলা হয়েছে, অনুরূপ অন্যান্য বাতিল ধর্মকেও দীন বলা হয়েছে। তবে আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন কবুল করবেন না।

এ ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা মুশরিক ও আহলে কিতাবদের সম্বোধন করে বলেছেন,

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾

হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।^(২৬)

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।^(২৭)

দীন শব্দটি সাধারণ অর্থে সব ধরনের ধর্ম, মতবাদ বা জীবনব্যবস্থাকে বোঝায়। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে একমাত্র ইসলামই হলো সত্য দ্বীন, যা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য এবং পূর্ববর্তী নবীদের আনা সত্য দ্বীনেরই পরিপূর্ণ রূপ। মোটকথা, সব ধর্মই দ্বীন নামে পরিচিত। তবে ইসলাম হলো প্রকৃত, একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন। সুতরাং ইসলাম একমাত্র সত্য দ্বীন আর বাকি সব মিথ্যা বা বাতিল দ্বীন।

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾

وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনিই (আল্লাহ) ওই সত্তা, যিনি হেদায়েত ও সত্য দ্বীন দিয়ে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি একে সকল দ্বীনের ওপর জয়যুক্ত করেন; যদিও মুশরিকরা (তা) অপছন্দ করে।^(২৮)

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যা সকল ধর্মই ‘দ্বীন’ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। তবে ‘দীনে হক’ বলা হলে শুধু ‘সত্য ধর্ম’ বোঝাবে।

^{২৫} সূরা আলে ইমরান : ৮৫

^{২৬} সূরা নিসা : ১৭১

^{২৭} সূরা নিসা : ১৭১

^{২৮} সূরা তাওবাহ : ৩৩

কুরআনে ‘দীন’ শব্দটি মোট পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—

১. কর্তৃত্ব ও আধিপত্য,
২. ইবাদত ও আনুগত্য,
৩. হুদুদ, আইন-কানুন ও অনুসৃত পথ-পন্থা,
৪. হিসাব-নিকাশ, বিচার, প্রতিদান ও শাস্তি।
৫. সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

মূলতাক ইবারতে ‘দীন’ শব্দটি দ্বারা এই পঞ্চম অর্থটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।
কুরআনের যেসব আয়াত দীন শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থ—কর্তৃত্ব ও
আধিপত্য এবং ইবাদত ও আনুগত্য—নির্দেশ করে :

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ
وَرَزَقَكُم مِّنَ الْطَّيِّبَاتِ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. هُوَ الَّذِي
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন
আবাসস্থল এবং আকাশকে করেছেন ছাদ। আর তোমাদের আকৃতি
বানিয়েছেন এবং সুন্দর বানিয়েছেন তোমার আকৃতি। এবং তোমাদের
দান করেছেন পরিচ্ছন্ন বস্ত্রসমূহ। এই আল্লাহই তোমাদের রব। তিনিই
চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। **অতএব তোমরা তাঁর ইবাদতে
একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকে ডাকো।** সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র
জগতের রব।^(২৯)

যেসব আয়াত দীন শব্দের তৃতীয় অর্থ—হুদুদ, আইন-কানুন ও অনুসৃত পথ-
পন্থা—নির্দেশ করে :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

হুকুম তো কেবল আল্লাহর। তিনি আদেশ করেছেন যে, ‘তোমরা তাকে ছাড়া
আর কারও ইবাদত করো না।’ **এ-ই সরল পথ।**^{৩০}

^{২৯} সূরা গাফির : ৬৪-৬৫

^{৩০} সূরা ইউসুফ : ৪০

ইমাম আলুসি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ১২৭০ হি.) সূরা তাওবার آَلِیُّنَ الْقَیِّمِ -এ ‘দীন’ শব্দের একটি অর্থ
করেছেন,

﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾

এভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল বাতলিয়ে দিলাম। বাদশাহের আইনে তিনি আপন ভাইকে কখনো আটক করতে পারতেন না, তবে আল্লাহর ইচ্ছা করলে (ভিন্ন কথা)।^(৩১)

যেসব আয়াত দ্বীন শব্দের চতুর্থ অর্থ—হিসাব-নিকাশ, বিচার, প্রতিদান ও শাস্তি—নির্দেশ করে :

﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ. وَإِنَّ الَّذِينَ لَوْعٌ﴾

তোমাদের সঙ্গে যার অঙ্গীকার করা হয়, তা অবশ্যই সত্য। এবং নিশ্চয় ন্যায়বিচার সংঘটিত হবেই।^(৩২)

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْذِّينِ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ. وَلَا يَحْضُ عَلَى

طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾

আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচারকে অস্বীকার করে? এবং সে-ই তো ওই ব্যক্তি, যে এতিনকে ধাক্কা দেয়। এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করে না।^(৩৩)

উপরোক্ত চারটি অর্থের সমন্বয়ে ‘দ্বীন’-এর একটি মর্ম দাঁড়ায়, যা চারটি অংশে বিভক্ত—

১. হাকিমিয়াত তথা শাসনক্ষমতা ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব;
২. সেই শাসনক্ষমতার প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার;
৩. সেই শাসনক্ষমতার অধীনে গঠিত ফিকরি ও আমলি ব্যবস্থাপনা;
৪. সেই ব্যবস্থাপনার প্রতি অনুগত ও একনিষ্ঠ থাকার বদৌলতে প্রতিদান লাভ এবং তার সাথে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার পরিণামে সাজা ভোগ।

যেসব আয়াত দ্বীনের পঞ্চম অর্থ—জীবনব্যবস্থা—নির্দেশ করে :

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾

ওকিল: المراد من الدِّينِ الحكم والقضاء ومن القِيمِ الدائم الذي لا يزول أي ذلك الحكم الذي لا يبدل ولا يغير ونسب ذلك إلى الكلبي، وقيل: الدين هنا بمعنى الحساب ومنه. (روح المعاني ২/২৮৩, تحت سورة التوبة: ৩৬)

^{৩১} সূরা ইউসুফ : ৭৬

^{৩২} সূরা যারিয়াত : ৫-৬

^{৩৩} সূরা মাউন : ১-৩

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٧٨﴾

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি লোকদের দেখবেন, তারা দলে দলে দিনে প্রবেশ করছে, তখন আপনি স্বীয় রবের সপ্রশংস তাসবিহ পাঠ করতে থাকবেন এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল।^(৩৪)

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) ধীন কেবল ইসলামই।^(৩৫)

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾

আর যে-কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধীন অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ থেকে তা মোটেই গ্রহণ করা হবে না। আর সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।^(৩৬)

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

তিনিই (আল্লাহ) ওই সত্তা, যিনি হেদায়েত ও সত্য ধীন দিয়ে রাসূল পাঠিয়েছেন, যেন তিনি একে সকল ধীনের ওপর জয়যুক্ত করেন; যদিও মুশরিকরা (তা) অপছন্দ করে।^(৩৭)

মোটকথা, সাধারণ অর্থে ধীন হচ্ছে জীবনব্যবস্থা। আর যে ব্যবস্থাকেই মানুষ আনুগত্য ও বিনম্রচিত্তে গ্রহণ করে নেয়, সেটিই একটি ধীন; যদিও সেখানে আল্লাহ, নবী বা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের কোনো বিষয়-আশয় না থাকে।



^{৩৪} সূরা নাসর : ১-৩

^{৩৫} সূরা আলে ইমরান : ১৯

^{৩৬} সূরা আলে ইমরান : ৮৫

^{৩৭} সূরা তাওবাহ : ৩৩

তৃতীয় ভূমিকা

ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতা : স্বতন্ত্র দুই জীবনদর্শন^(৩৮)

দুটি ধর্ম, জাতি ও সভ্যতার মাঝে পার্থক্য বোঝার জন্য কিছু মৌলিক দার্শনিক উপাদান জানা জরুরি। ইসলামি জীবনবিধান ও হিউম্যানিজমের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করার জন্য পাঁচটি মৌলিক দার্শনিক ভিত্তি আছে। এগুলো আমাদের জানা দরকার। কারণ আজকের যুগে ইসলামি জীবনবিধানের সঙ্গে সবচেয়ে বড় সংঘাত যে জাহিলিয়াতের, তা হলো মানবতাবাদ (Humanism) বা পশ্চিমা সভ্যতা। সুতরাং ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতায় মানুষের চিন্তা-দর্শন ও আকিদা-বিশ্বাসে মৌলিক কী পার্থক্য রয়েছে, তা জানার আগে ওই মৌলিক দার্শনিক ভিত্তিগুলো উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেগুলো হলো—

১। অতিপ্রাকৃত দর্শন (Metaphysics)

২। জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology)

৩। নীতিশাস্ত্র (Ethics)

৪। মূল্যতত্ত্ব (Axiology)

৫। সৌন্দর্যতত্ত্ব (Aesthetics)

অতিপ্রাকৃত দর্শনের (Metaphysics) আলোচ্য বিষয় : অদৃশ্য ও অতীন্দ্রিয় বিষয়সমূহ। যেমন : আল্লাহর পরিচয় কী, ওহী, নবুওয়ত, কেয়ামত, কবর ও হাশর কী—এগুলো অতীন্দ্রিয় ও অদৃশ্য বিষয়।

^{৩৮} এই পুরো লেখাটি নেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের বিখ্যাত দেওবন্দি আলেম জামিয়া সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ আল-আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত মুহতামিম, বিশিষ্ট ফকিহ ও উসুলবিদ মুফতি মুহসিন গুলজার সাহেবের দরস সংকলন ‘ফাত্বে উসুলে ফিকহ’ গ্রন্থ থেকে। সহজবোধ্যতার জন্য কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে লেখাটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

জ্ঞানতত্ত্বের (Epistemology) আলোচ্য বিষয় : জ্ঞান ও জ্ঞানার্জনের উৎস। অর্থাৎ কোন জিনিস জ্ঞানের উৎস আর কোন জিনিস জ্ঞানের উৎস নয়। কোনটি থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান সঠিক আর কোনটি থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ভুল ইত্যাদি।

নীতিশাস্ত্রের (Ethics) আলোচ্য বিষয় : ভালো-মন্দ, নৈতিকতা-অনৈতিকতা ইত্যাদি। অর্থাৎ নৈতিকতা কী, কে তা নির্ণয় করবে, কীসের ভিত্তিতে নির্ণয় করবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা হয়।

মূল্যতত্ত্বের (Axiology) আলোচ্য বিষয় : জীবনের মূল্য কী, মূল্য বা Values কাকে বলে, কোনো কিছুকে মূল্যবান বলার মানদণ্ড কী, কল্যাণ ও অকল্যাণের ভিত্তি কী ইত্যাদি।

সৌন্দর্যতত্ত্বের (Aesthetics) আলোচ্য বিষয় : সৌন্দর্য কাকে বলে, কোনটা সুন্দর আর কোনটা অসুন্দর, সুন্দরটা কেন সুন্দর এবং অসুন্দরটা কেন অসুন্দর ইত্যাদি।

দর্শনের এই পাঁচটি উপাদান মানবজীবনের তিনটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে :

১. বিশ্বতত্ত্ব (Cosmology / ترتيب حقيقت)—বিশ্বজগৎ কীভাবে সৃষ্টি হলো, কে সৃষ্টি করল, কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে...

২. অস্তিত্বতত্ত্ব (Ontology / حقيقت في نفسه)—অস্তিত্বের মৌলিক প্রকৃতি কী, কোনো বস্তু অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থ কী, কোনটা অস্তিত্বশীল আর কোনটা অস্তিত্বহীন, আমাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা কি অস্তিত্বশীল না অস্তিত্বহীন...

৩. উদ্দেশ্যবাদ (Teleology / مقصد حقيقت)—আমার অস্তিত্ব ও সমগ্র বিশ্বজগতের উদ্দেশ্য কী, এর চূড়ান্ত লক্ষ্য বা পরিণতি কী...

১। অতিপ্রাকৃত দর্শন (Metaphysics) :

অতিপ্রাকৃত, অধিবিদ্যা বা (ইসলামি পরিভাষায়) গায়েব সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, এর প্রকৃত জ্ঞান শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালায় কাছেই আছে। মানুষ গায়েবের বিষয় সম্পর্কে জানার একমাত্র পদ্ধতি হলো ওহী ও ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান।

পশ্চিমা দর্শনে অতিপ্রাকৃত বিষয় জানার মাধ্যম হলো—যুক্তি (Reason), ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা (Experience) এবং কারও কারও মতে অন্তর্দৃষ্টি (Intuition)।

২। জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) :

ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভুল উৎস হলো ওহী—কুরআন ও হাদিস। এরপর ধারাবাহিকভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়, আকল, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ। তবে এগুলো তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন ওহীর বিপরীত না হয়; অন্যথায় এগুলো বাতিল বলে গণ্য হবে।

পশ্চিমা দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের সর্বোচ্চ স্তরেও স্বয়ং মানুষ। অর্থাৎ মানুষের মতামত, ইচ্ছা, কামনা ও বুদ্ধিই সর্বোচ্চ সত্য হিসেবে ধর্তব্য হয়।

অতিপ্রাকৃত দর্শন ও জ্ঞানতত্ত্বের আলোকে পূর্বোক্ত মৌলিক তিনটি প্রশ্নের উত্তর—

বিশ্বতত্ত্ব (Cosmology) সম্পর্কে ইসলামের অকাট্য কথা হলো, এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি, বিন্যাস, পরিচালনা—সবকিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই করেছেন এবং করছেন। এটা আমরা জানতে পেরেছি ওহীর মাধ্যমে।

আর পশ্চিমা সভ্যতার দাবি, এগুলো শ্রমীর কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে। যা তারা বিগ ব্যাং ইত্যাদি তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করে থাকে।

অস্তিত্বতত্ত্ব (Ontology) সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য হলো তার সঠিক জ্ঞান অর্জন হবে কুরআন ও হাদিস থেকে। আর পশ্চিমা সভ্যতা সভ্যতার অস্তিত্ব (Ontology) নির্ধারণ করে মানবীয় যুক্তি, বুদ্ধি ও মতামতের ভিত্তিতে।

উদ্দেশ্যবাদ (Teleology) সম্পর্কে ইসলামের সিদ্ধান্ত হলো, মুসলমানের জীবনের উদ্দেশ্য কুরআন ও হাদিস থেকে নির্ধারিত হবে। পক্ষান্তরে পশ্চিমের সিদ্ধান্ত হলো, মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য নিজ নিজ ব্যক্তিগত সত্তা থেকে গ্রহণ করা হবে।

৩ ও ৪। নীতিশাস্ত্র (Ethics) ও মূল্যতত্ত্ব (Axiology) :

ইসলামের দৃষ্টিতে ভালো-মন্দ ও নৈতিক-অনৈতিক নির্ধারণের মাপকাঠি হলো—কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। এ চারটি দলিলের ভিত্তিতে হালাল-হারাম, জায়েয-নাযায়েয নির্ধারিত হয় এবং এগুলোর ভিত্তিতেই কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে মূল্যায়ন বা অবমূল্যায়ন করা হয়। আর পশ্চিমাদের কাছে ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাপকাঠি হলো, স্বাধীনতা (freedom), সমতা (equality) ও উন্নতি (development)।

পশ্চিমের তিনটি মূলনীতির পরিচয়

ক। স্বাধীনতা :

আমি যা ইচ্ছা তা-ই করব এবং যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই করব। কারও কাছে

আমি দায়বদ্ধ নই এবং কেউ আমাকে জবাবদিহি করতে পারবে না। হোক সে আমার পরিবার, পিতা-মাতা, ঈশ্বর, ধর্ম, সমাজ বা অন্য যে-কেউ। পশ্চিমা সভ্যতায় স্বাধীনতা বলতে এ প্রকার স্বাধীনতাই উদ্দেশ্য।

ব্যক্তির ইচ্ছা ও স্বাধীনতার কাছে সামাজিক মূল্যবোধের কোনো গুরুত্ব নেই। ব্যক্তি যা ভালো মনে করবে, সেটাই ভালো; আর যা খারাপ মনে করবে, সেটাই খারাপ। অর্থাৎ হিউম্যানিজম ধর্মে মানুষকেই ন্যায়-অন্যায় বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সমকামিতা বৈধ না-কি অবৈধ, পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে বিবাহ করা বৈধ না-কি অবৈধ—এটা নির্ভর করে ব্যক্তির ইচ্ছা ও চাহিদার ওপর। যদি কেউ এটা করতে চায় তাহলে তার জন্য এটা বৈধ।

স্বাধীনতার দর্শন থেকে উদ্ভূত কিছু মাসায়েল

পশ্চিমা সভ্যতা স্বাধীনতার যে দর্শন আমাদের সামনে পেশ করে, ইসলামের দৃষ্টিতে তাকালে তা বহু সমস্যার জনক। যেমন :

১। স্বেচ্ছায় কৃত ব্যভিচার (যিনা) বৈধ।

২। সমকামিতা বৈধ।

৩। মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীন। ইসলাম ধর্ম ত্যাগের কারণে কাউকে হত্যা করা বা তার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অ্যাকশনে যাওয়া গুরুতর অপরাধ। কারণ, যখন ধর্মের কোনো বিশেষ গুরুত্ব নেই এবং মানুষ নিজেই নিজের খোদা, তখন ধর্ম পরিবর্তনে কী অসুবিধা থাকতে পারে?

৪। ধর্মের সমালোচনা করা বা ধর্মীয় কোনো বিধান নিয়ে সমালোচনা করা সম্পূর্ণ বৈধ। এতে বাধা দেওয়া মানে বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা।

৫। সব ধরনের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে দেওয়া।

বস্তুত ‘ধর্মীয় স্বাধীনতা’ নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতাকে উসকে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবীর কোনো ধর্মই তার অনুসারীদের এমন স্বাধীনতা দেয় না যে তারা নিজেরাই সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করবে এবং যখন ইচ্ছা ধর্ম ছেড়ে বের হয়ে যাবে।

খ। সমতা :

স্বাধীনতার পর পশ্চিমা দর্শনে যে নীতিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়, তা হলো সাম্য বা সমতা। পশ্চিমা চিন্তাবিদদের মতে, কোনো বিষয়ের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা ও ন্যায্যতা-অন্যায্যতা নির্ধারণ করা হবে দুটি প্রশ্নের আলোকে :

১. এতে মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না তো?

২. এতে মানুষের সমতা লঙ্ঘিত হচ্ছে না তো?

পশ্চিমের কথা হলো, প্রতিটি মানুষকেই বিবেক ও বুদ্ধি দান করা হয়েছে। যা সবার মধ্যে সমান। তাই আকলের বিবেচনায় সব মানুষ সমান। অতএব তাদের জন্য সামাজিক ও ধর্মীয় বিধানও সমান হতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে এই দর্শনের নেতিবাচক কিছু ফলাফল হলো—

১। পুরুষ ও নারী, মুসলিম ও কাফের, নবী ও উম্মত, বাবা ও ছেলে, দাদা ও নাতি—সবাই সমান।

২। বাবা তার ছেলেকে বকা দিতে পারবে না, কারণ ছেলেও বাবার মতো স্বাধীন এবং সমান মর্যাদার অধিকারী।

৩। তালাক, উত্তরাধিকার-সহ সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকার সমান।

যারা পশ্চিমা সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে কিংবা অজ্ঞতার কারণে যাচাই-বাছাই না করে সমতার নীতি গ্রহণ করে, তারা ইসলামের মাঝেও খুঁজে খুঁজে সমতা বের করার চেষ্টা করে। যেমন অমুক অমুক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমান, তাই ইসলামও নাকি সমতা শিক্ষা দেয়। অথচ ইসলাম কখনোই সমতাকে সামগ্রিক ও সর্বজনীন আইন হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। এখানেই ইসলাম ও পশ্চিমা সমতার মূল পার্থক্য।

পশ্চিমের ধারণা : সব মানুষ যেহেতু স্বাধীন এবং তার আকল আছে, তাই নারী-পুরুষ, বাবা-ছেলে, দাদা-নাতি, নবী-উম্মত, মুসলিম-কাফের—সবার অবস্থান সমান।

ইসলামের ধারণা : সমতার ভিত্তি স্বাধীনতা বা আকল নয়। ইসলাম যেখানে সমতার কথা বলেছে, সেখানে আল্লাহর নির্ধারিত আইন হিসেবে বলেছে। মুসলিমরা সে আইন পালন করতে বাধ্য। যেমন—বড় ভাই ও ছোট ভাই উত্তরাধিকারসূত্রে সমান অংশ পাবে। এর কারণ হলো আল্লাহ তাআলা অংশ সমান নির্ধারণ করেছেন, তাই সমানভাবে দেওয়া হবে।

অতএব, ইসলামে সমতা মানে মানবিক যুক্তির ভিত্তিতে সমতা নয়, বরং আল্লাহর আইন ও বিধানের ভিত্তিতে সমতা।

গ। উন্নতি :

পশ্চিমা দর্শনে উন্নতি বলতে বোঝানো হয় মানুষের জীবন ও সমাজ ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছে। তারা মনে করে ইতিহাস সরলরেখার মতো সামনে এগোয়, যেখানে প্রতিটি যুগ আগের যুগের চেয়ে উন্নততর। এই উন্নতির মূলভিত্তি মানুষ নিজেই; তার বুদ্ধি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই অগ্রগতির চালিকাশক্তি। তাই ধর্ম বা

আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে তারা মানুষকে কেন্দ্রস্থলে রাখে। এই ধারণায় স্বাধীনতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্যক্তি যেন নিজের ইচ্ছামতে জীবনযাপন করতে পারে, সেটাই প্রগতির অন্যতম মানদণ্ড। পশ্চিমা দর্শনের মতে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পের বিকাশই মানবজীবনকে সহজতর ও উন্নত করে তোলে। তাদের বিশ্বাস হলো, বিজ্ঞানের মাধ্যমে দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়কে মানুষের খাহেশাত অনুযায়ী রূপান্তর করাই প্রকৃত উন্নতি।

পশ্চিমে বস্তুবাদী এই উন্নতিকে কেবল একটি মূলনীতি না বলে, একটি আকিদা বা বিশ্বাস আখ্যায়িত করাই অধিক যথাযথ। উন্নতি আসলে স্বাধীনতারই একটি বস্তুবাদী রূপ। স্বাধীনতা অর্জন এবং নিজের প্রতিটি ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা শুধু পুঁজির মাধ্যমেই সম্ভব। অর্থাৎ, স্বাধীনতার একটি বস্তুবাদী অস্তিত্ব হলো পুঁজি। এই পুঁজি অর্জনের উন্নতিকেই উন্নয়ন বা ডেভেলপমেন্ট বলা হয়। কারণ, স্বাধীনতার অর্থ হলো কোনো সীমাবদ্ধতা বা বাধা ছাড়াই যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারা।

মোটকথা, এই তিনটি মূলনীতির মাধ্যমেই পশ্চিমে নীতি-নৈতিকতা নির্ধারণ (Ethics) করা হয় এবং কোনো ব্যক্তিকে মূল্যায়ন-অবমূল্যায়ন (Axiology) করা হয়।

৫। সৌন্দর্যতত্ত্ব (Aesthetics) :

ইসলামের দৃষ্টিতে সৌন্দর্যতত্ত্ব হলো—এমন প্রতিটি কথা ও কাজ পরিত্যাগ করা যা দুনিয়া বা আখেরাতের জীবনে কোনো কাজে লাগে না। ইসলাম শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতিই নয়, বরং আত্মিক সৌন্দর্যের প্রতিও বিশেষ জোর দেয়। যেমন : চিন্তা-চেতনা পরিশুদ্ধ করা, নীতি-নৈতিকতা ও স্বভাব-চরিত্র নির্মল ও পবিত্র রাখা ইত্যাদি। যেসকল সৌন্দর্যবোধ মানুষের দুনিয়া বা আখেরাতের জীবনে কোনো কাজে লাগে না বা সর্বোপরি তা মানুষের নৈতিকতা ও চরিত্রকে ধ্বংস করে, ইসলামের দৃষ্টিতে তা সুন্দর নয় বরং নিন্দনীয়।

পশ্চিমা সভ্যতা বলে, মানুষের মনোবাসনা পূরণে সাহায্য করে এমন প্রতিটি জিনিস—যেমন ধন, জ্ঞান, শিল্প, সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, অভিনয়—সৌন্দর্যের উদাহরণ। পশ্চিমের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য মূলত বাহ্যিক এবং অনুভূতিমূলক। অর্থাৎ যা চোখে বা মনে আনন্দ দেয়; চাই সেটা যা-ই হোক, তার মাধ্যমে নীতি-নৈতিকতার যতই ক্ষতি হোক। তারা নৈতিকতা বা চিন্তাভাবনার তুলনায় বস্তুবাদী ও মানসিক আনন্দকে সৌন্দর্যের উচ্চতম উদাহরণ মনে করে।

আলোচনার সারসংক্ষেপ : অতিপ্রাকৃত জ্ঞান (Metaphysics), জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology), নৈতিকতা (Ethics), মূল্যবোধ (Axiology) এবং সৌন্দর্যতত্ত্বের (Aesthetics) মূলনীতিগুলো যদি দুই ব্যক্তি, সমাজ বা দুই জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে তাদের ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র-নৈতিকতা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সমাজের যাবতীয় ব্যবস্থার নীতিমালা কখনোই এক হতে পারে না; যদিও কোথাও তাদের শব্দ, পরিভাষা ও মৌখিক বক্তব্য এক রকম হয়ে যাক না কেন। কারণ তাদের অধিবিদ্যা ও অন্যান্য মূলনীতিগুলোর মাঝেই রয়েছে ভিন্নতা। উদাহরণত, ‘স্বাধীনতা’ শব্দটির অর্থ ইসলামে এবং পশ্চিমা সভ্যতায় এক নয়; আসমান-জমিন পার্থক্য। কারণ, উভয়ের মৌলিক দার্শনিক ভিত্তিই ভিন্ন; তাই বাহ্যিকভাবে তা এক মনে হলেও, উভয়ের মাঝে রয়েছে লাঞ্ছনা ভিন্নতা।

হিউম্যানিজম (পশ্চিমা সভ্যতা) : এক নতুন ধর্ম

হিউম্যানিজম—এক আকর্ষণীয় মোড়ক; তবে এর ভেতরে রয়েছে স্তূপীকৃত ভয়ানক দুর্গন্ধ ও কদর্যতায়ুক্ত আধুনিক কুফর। এ কুফর পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিক দুর্গন্ধময় ও ভয়াবহ।

আধুনিক এ কুফর ও জান্দাকা আমাদের সমাজে দ্বীন থেকে দূরে থাকা ছেলে-মেয়েদের ঈমান ছিনতাই করছে এবং চুপিসারে ইরতিদাদ-ধর্মতাগের পরিবেশ কায়ম করছে। এই কুফর হিন্দু, খ্রিষ্টান বা ইহুদি ধর্মের পোশাকে আসেনি; এসেছে বিজ্ঞান, গবেষণা ও যুক্তিবাদের পোশাকে। এ ধর্মের কোনো নির্দিষ্ট নাম নেই, অন্য ধর্মের যেমন রয়েছে—হিন্দু, ইহুদি ইত্যাদি। এ ধর্মের কাছে আকিদা ও ওহীর সামান্যতম গুরুত্বও নেই; তবে বিজ্ঞান, যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার গুরুত্ব রয়েছে ঢের। এই ধর্মের অনুসারীরা ইসলাম নাম উচ্চারণ না করেও মহাবিশ্ব ও মানুষ সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইসলাম নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। নাউজুবিল্লাহ!

পূর্বেকার জামানায় যারা মুরতাদ হতো, তারা পুরোনো কোনো মিথ্যা ধর্ম গ্রহণপূর্বক মন্দির, গির্জা ইত্যাদিতে গিয়ে ইবাদত করত। মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিমদের থেকে সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক—সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করত। জীবনযাপন, আহার-খাদ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পূর্ণ বৈপরীত্য ধারণ করত। ফলে বুঝা যেত যে, এর সাথে এখন থেকে মুসলিম সমাজ, কুরআন, ইসলাম বিশেষভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু এই আধুনিক কুফর—হিউম্যানিজম ধর্মে অন্তর্ভুক্তির সময় আল্লাহ, রাসূল, ওহী, আখেরাত সব অস্বীকার করা সত্ত্বেও এ ধর্ম তার অনুসারীদের অনুমতি প্রদান করে, যাতে তারা নাম, সংস্কৃতি, ইবাদত, খাদ্য, ব্যবসা-বাণিজ্যে ইসলামের ছাঁচের অনুসরণ করে। শুধু দীন-ধর্মের উপর্যুক্ত বিষয়গুলো অস্বীকার করে আর বেশভূষা ও চলাফেরায় মুসলিম সমাজের সাথেই থাকে।

পূর্বে কাকের-মুরতাদদের জন্য আবশ্যক ছিল—ইবাদত, লেনদেন, চলাফেরা-সহ সার্বিকভাবে মুসলিম জামাত থেকে দূরে থাকা। তবে এখন আর এগুলো আবশ্যক নয়; বরং গোপনে আল্লাহ-রাসূলকে অস্বীকার করা এবং এর বিপরীতে যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও পণ্ডিত্রিয়ে অনুধাবনযোগ্য বিষয়গুলোকে মেনে নেওয়াই যথেষ্ট।

আধুনিক ধর্মের অনুসারীদের ইসলাম থেকে বিমুখতার কিছু কারণ

ক. আর্থিক কারণ : তাদের ধারণা হলো, অর্থনীতিতে ইসলাম অপূর্ণ। জীবনযাপনে ইসলামি ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য কিছু নয়। আধুনিক যুগের আর্থিক সংকটের সমাধান—ইসলামের সাধ্যাতীত।

খ. অবাধ যৌনতার বিরোধিতা : অনৈতিক অশ্লীলতা ও অবাধ যৌনতার সমর্থন ইসলাম দেয় না। তাই তারা ইসলামের প্রতি বিরাগভাজন ও ইসলামকে নিজেদের বিরোধী ভাবে। তারা বলে, আমাদের ইচ্ছেমতো জীবনযাপনে ইসলাম লাগাম টেনে দেয়, বাধা দেয়। আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। এমনটা ইসলাম কেন করবে? বরং অবাধ চলাফেরা ও যৌনতার স্বাধীনতা থাকা উচিত। আমরা নিজেদের ইচ্ছেমতো চলাফেরা করব এবং যৌন চাহিদা পূরণ করব। ইসলামের উচিত নয় এখানে বাধা দেওয়া।

গ. ইসলামি রাষ্ট্র ও রাজনীতি : এমন মানুষও আছে, যারা ইসলামের রাষ্ট্র ও রাজনীতির ধারণাকে আধুনিক যুগে হাসিঠাট্টার বিষয় মনে করে। তারা বলে, ইবাদত ও পার্সোনাল লাইফে তো ইসলাম ঠিক আছে। কিন্তু রাষ্ট্র-রাজনীতির সাথে ইসলামের কী সম্পর্ক? এখানে ইসলাম মতামত দেবে কেন?

ঘ. অনৈতিক শারীরিক সম্পর্কে ইসলামের লাগাম : কিছু মানুষের ধারণা হলো, অনৈতিক শারীরিক সম্পর্কে ইসলাম যে লাগাম টেনে ধরে, এটা প্রকৃতি (nature) বিরোধী, সুস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, এবং যুগ চাহিদা পরিপন্থী। এভাবে তারা ইসলামকে হাসিঠাট্টার পাত্র বানিয়ে অজান্তেই ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।

ঙ. ইবাদতকে অনর্থক ও বোঝা মনে করা : কিছু মানুষ ইসলামের প্রবর্তিত ইবাদতের পদ্ধতিকে অনর্থক মনে করে। এদের কারও ইচ্ছা যাকাত বাদ দেওয়া, কারও ইচ্ছা হজ বাদ দেওয়া। আবার কেউ কেউ কুরবানিকে মনে করে সম্পদের অপচয় ও পশুদের ওপর জুলুম। কেউ আবার নামাজকে মনে করে শারীরিক কসরত মাত্র।

চ. অনৈসলামিক ধ্যানধারণায় ইসলামি রং লাগানো : কেউ কেউ ইসলামের নাম করে ইসলামের মূলকেই অস্বীকার করে, ঠাটা করে এবং নিজের অনৈসলামিক ধ্যানধারণাকে ‘ইসলামিক’ বলে মনে করে। এদের অধিকাংশের তো জানাই নেই যে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। কেননা মূলহিদ ও জিন্দিকদের মতো ইবাদত, লেনদেন ইত্যাদিতে তারা মুসলিমদের মতোই থাকে, তবে ধ্যানধারণায় নিজস্বতা পোষণ করে। এরা অনৈসলামিকে ইসলামের রূপ দিয়ে পেশ করতে চায়। প্রকৃত ইসলামকে এরা ঘৃণা করে ও কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

এ হলো ইসলামের সঙ্গে বিদ্রোহ ও শত্রুতার মৌলিক কিছু কারণ, যা আরও গোড়া থেকে গভীরভাবে জানা আমাদের জন্য আবশ্যিক।



চতুর্থ ভূমিকা

কুরআনের আলোকে পশ্চিমা সভ্যতার বিশ্বাসের মূল্যায়ন

এক. আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা মৌলিক যে আকিদা-বিশ্বাস নিজের মাঝে ধারণ করে এবং যে বিশ্বাস থেকে অন্যান্য কুফর ও বিভ্রান্তি ডালপালা ছড়ায়, তার একটি ইঙ্গিত আমরা কুরআনের ভাষায় পাই। আল্লাহ তাআলা সূরা জাসিয়ার ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَلَّبَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غَشَاةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾

আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিজের প্রবৃত্তিকে স্বীয় প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ তাকে জেনেশুনে পথভ্রষ্ট করেছেন। তার কান ও অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন? অতঃপর আল্লাহর পর কে তাকে সৎপথে আনবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা করো না? তারা বলে ‘জীবন বলতে আমাদের এই দুনিয়ার জীবনটাই। আমরা মরি ও বাঁচি। এবং কালই আমাদের মৃত্যু ঘটায়।’ বস্তুত এ ব্যাপারে ওদের কোনো জ্ঞান নেই। সবটাই ওদের অনুমান।

আয়াত দুটিতে পশ্চিমা সভ্যতার মৌলিক দুটি আকিদাই যেন তুলে ধরা হয়েছে—

১। ‘নিজের প্রবৃত্তিকে স্বীয় প্রভু বানিয়ে নিয়েছে’—পশ্চিমা সভ্যতার মৌলিক বিশ্বাস হলো, আল্লাহ নয়, মানুষই সকল কিছুর মূল। মানুষের জীবনের জন্য আল্লাহর সিদ্ধান্ত নয়; মানুষের নিজেদের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। পশ্চিমা প্রতিটি মতবাদের সারকথা এটাই। ইনশাআল্লাহ বইয়ের

প্রতিটি অধ্যায়েই এই বাস্তবতা স্পষ্ট হবে।

২। ‘জীবন বলতে আমাদের এই দুনিয়ার জীবনটাই’—পশ্চিমা সভ্যতার দ্বিতীয় মৌলিক বিশ্বাস এটি। তাই মানুষের জীবনের যত অনুষঙ্গ আছে সবকিছু বিবেচিত হবে, আলোচিত হবে ও গ্রহণীয় হবে দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে। এর বাহিরে অন্য কোনো জগৎ নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই।



পঞ্চম ভূমিকা পশ্চিমা সভ্যতার গোড়ার কথা

গ্রীক ও রোমান জাহিলিয়াতই হচ্ছে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল উৎস ও ভিত্তি, যা পশ্চিমা উৎসগুলো অকপটে স্বীকার করেছে। যদিও তারা তাকে জাহিলিয়াত বলে না; বরং তারা একে সভ্যতা বলে দাবি করে। তবে এটা ঠিক যে, আধুনিক পশ্চিমা নবজাগরণে তারা ইসলামি সভ্যতা ও মুসলিমদের জ্ঞানভান্ডার থেকে অনেক উপকৃত হয়েছে এবং তারা তা স্বীকার করতে বাধ্যও হয়েছে। কিন্তু এই জাগরণ ইসলামি ধারায় অগ্রসর হয়নি এবং ইসলামি সভ্যতা ও শিক্ষার মৌলিক বিষয়—তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতকে গ্রহণ করেনি; বরং নিজেকে সম্পূর্ণ গ্রীক-রোমান রঙে রঞ্জিত করেছে এবং পূর্বের পৌত্তলিকতার দিকে ফিরে গিয়েছে। প্রথমদিকে গ্রীক ও রোমান সভ্যতা এবং তাদের জ্ঞানের উৎসগুলোকে খ্রিস্টীয় ভাবধারার একটি পাতলা আবরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সময়ের আবর্তনে সেই আবরণ ক্রমশ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ধর্মীয় সে আবরণ চূড়ান্তভাবে বিলীন হয়ে গেছে।

এজন্য পশ্চিমা সভ্যতাকে ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য গ্রীক ও রোমান সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও বিচ্যুতিগুলো জেনে রাখা অপরিহার্য।

গ্রীক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও প্রধানতম বিকৃতি

যেকোনো সভ্যতার মাঝেই বাহ্যত কিছু বৈশিষ্ট্য ও উন্নতি-অগ্রগতির ছাপ থাকে, যা থেকে পৃথিবীর ইতিহাসের কোনো সভ্যতাই খালি নয়। কিন্তু একটি সভ্যতার মূল্যায়নের মূলভিত্তি হলো তার আকিদা-বিশ্বাস। কুরআন অতীতের সভ্যতাগুলোকে এভাবেই মূল্যায়ন করেছে। যাতে মুসলমানরা নিত্যনতুন কোনো সভ্যতার বাহ্যত উন্নতি ও অভ্যন্তরীণ বিজয় দেখে প্রতারণার শিকার না হয়; বরং তার হাকিকত ও বাস্তবতা খুঁজে বের করে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

গ্রীক পূর্ব যুগে মানুষের মাঝে যত গোমরাহি দেখা যায় তার মূলভিত্তি ছিল বহু ঈশ্বরবাদিতায় বিশ্বাস। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করা—গুণ-বৈশিষ্ট্য তাকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, আল্লাহর পাশাপাশি তাকেও ইবাদতের উপযুক্ত মনে করা ইত্যাদি। অর্থাৎ, খোদা ও খোদা থেকে প্রাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষাই হবে মানুষের জীবনের যাবতীয় সকল বিষয়ের সমাধানদাতা। মানুষের জীবনের ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়—সকল বিষয়ে খোদাই হবে চূড়ান্ত সমাধানদাতা। কিন্তু গ্রীক দার্শনিকরা বলল, খোদা নয়, মানুষই হবে সকল কিছুর মূল এবং মানুষ ও তার বসবাসের এই দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় যত বিষয় হতে পারে সবকিছুর সমাধানের মাপকাঠি হবে মানুষের নিজস্ব শক্তি—যুক্তি, অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। মানুষের জীবনের যত মৌলিক প্রশ্ন হতে পারে, যার উত্তরের একমাত্র উৎস পূর্বে ছিল ধর্ম, গ্রীক দার্শনিকরা বলল, এই সকল প্রশ্নের উত্তর মানুষ কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তা বা গ্রন্থের মাধ্যমে নয়; নিজস্ব শক্তি দিয়েই সমাধান করবে এবং এটিই হবে একমাত্র সঠিক সমাধান।

উদাহরণস্বরূপ : মানুষ কী, মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে, মানুষ কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, দুনিয়াতে মানুষের নিজ ইচ্ছানুযায়ী চলার অধিকার আছে কি না, যদি থাকে তাহলে তার সীমা কতটুকু, এই বিশাল জগৎকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে, এই বিশাল জগতের সৃষ্টিকর্তা কে, মানুষ এই দুনিয়ার জীবনকে কীভাবে পরিচালনা করবে, মানবজীবনের যাবতীয় মতানৈক্যের চূড়ান্ত সমাধানদাতা কে হবে, কোন মূলনীতিকে সামনে রেখে মানুষ দুনিয়ার সকল বিষয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করতে পারবে, মানুষ মারা যায় কেন, মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়, মানুষ মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবিত হয় না—কি নিঃশেষ হয়ে যায় ইত্যাদি।

পূর্বে এ সকল প্রশ্নের উত্তরের উৎস ছিল ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থ। কিন্তু গ্রীক দার্শনিকরা এসব প্রশ্নের সমাধানে মানুষের আকলকেই চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করে এবং যা আকল-বহির্ভূত তা বাতিল হিসেবে চিহ্নিত করে। এভাবে খোদাদ্রোহিতার এক নতুন বীজ গ্রীক দার্শনিকরা পৃথিবীর মাঝে রোপণ করে, যার চূড়ান্ত রূপ আজকের পশ্চিমা সভ্যতা। মানুষের ত্রুটিপূর্ণ আকলকে চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করা ছিল গ্রীক সভ্যতার সবচেয়ে বড় ভ্রান্তিগুলোর একটি।

গ্রীক সভ্যতার আরও কিছু মৌলিক ভ্রান্তি

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভি রহিমাতুল্লাহ গ্রীক সভ্যতার তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন :

১. যাকিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাতে বিশ্বাস এবং যাকিছু ইন্দ্রিয়াতীত তাতে অবিশ্বাস ও সংশয়।

২. ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতায় নিরাসক্তি এবং পার্থিব জীবন ও ভোগবিলাসে অতি আসক্তি।

৩. উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতা।

এরপর তিনি লেখেন, ‘গ্রীক সভ্যতার এই যে বিভিন্ন মৌলিক উপাদান, এগুলোকে আমরা যদি এক শব্দে প্রকাশ করতে চাই তাহলে “বস্তুবাদিতা” হলো সবচেয়ে যথার্থ শব্দ এবং এটাই হচ্ছে গ্রীক সভ্যতার মূল পরিচয়।’^(৩৯)

রোমান সভ্যতা ও তার বৈশিষ্ট্য

রোমানরা সাম্রাজ্য ও শক্তির দিক থেকে সে সময়ের অনন্য জাতি হলেও চিন্তা ও বিশ্বাসগত দিক থেকে তারা ছিল পূর্বের গ্রীক সভ্যতার উচ্ছিষ্টভোগী। কিন্তু তাদের মাঝে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা আজকের পশ্চিমা সভ্যতার মাঝে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

১. রোমান জাতির পৃথক যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী স্বভাব এবং জীবনের প্রতি আগাগোড়া জড়বাদী ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। বস্তুত এই জড়বাদ ও বস্তুবাদই ছিল রোমান জাতির ধর্ম এবং তাদের পরিচয়-প্রকৃতি। আজকের ইউরোপ রোমানদের থেকে এটাই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে।^(৪০)

২. রোমান জাতির অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল বিলাসিতা। তারা এটাকে জীবনের স্বাভাবিক অংশ হিসেবে নয়; বরং ভোগ-বিলাসকে একটি দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছিল।^(৪১)

৩. রোমান জাতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল বাহ্যিকতাবাদ। রোমানরা গ্রীক সভ্যতা থেকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হলেও তাদের এই বাহ্যিকতাবাদী বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা গ্রীক সভ্যতা থেকে শুধু ওই বিষয়গুলোই ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে, যা ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের বাহ্যিকতার সাথে সম্পৃক্ত। রোমানদের এই স্বভাবকেই আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা মডেল হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে।^(৪২)

৪. রোমান জাতি ধর্ম ও ধার্মিকতাকে কখনোই নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেনি। তারা শুধু নিজেদের সামাজিক বন্ধন ও জাতীয় ঐক্য টিকিয়ে রাখার জন্য দেবতাদের

^{৩৯} মুসলমানদের পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো, পৃ. ২৮৯, মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দা. বা. অনুদিত। প্রকাশনী : দারুল কলাম

^{৪০} মুসলমানদের পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভি, পৃ. ২৮৯

^{৪১} তায়াকুফে তাহজিবে মাগরিব, প্রফেসর মুফতি মুহাম্মদ আহমদ, পৃ. ৮১

^{৪২} জাদিদিয়াত, পৃ. ২৮, অধ্যায় : রোমি দাওর

প্রতি বিশ্বাসকে ব্যবহার করেছে; কিন্তু বাস্তব জীবনে তাদের কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ অনুমোদন করেনি। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার অন্যতম মূল বক্তব্য ও চিন্তা এটাই : ধর্ম যতক্ষণ বস্তুবাদী চিন্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ততক্ষণ ঠিক আছে, কিন্তু বাস্তব জীবনে ধর্মের কোনো স্থান নেই।^(৪৩)



^{৪৩} দেখুন, মুসলমানদের পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভি, পৃ. ২৯৮

ষষ্ঠ দ্ব্যমিকা পশ্চিমা সভ্যতার উৎপত্তিকাল

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা গ্রীক ও রোমান সভ্যতা থেকে উৎসারিত হলেও সময়ের আবর্তনে তা আজ যে রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা বুঝতে হলে ইউরোপে ঘটে যাওয়া তিনটি সময়কে আমাদের বুঝতে হবে: ১. রেনেসাঁ। ২. রিফরমেশন। ৩. এনলাইটেনমেন্ট। এই তিনটি সময়ের মূল ইতিহাস আমরা মূল বইয়ের বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে শুধু পশ্চিমা ইতিহাসের মৌলিক এই তিনটি সময়ের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও এগুলো মানুষের জীবনে কী-রকম প্রভাব ফেলেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরব। কারণ, পশ্চিমে তৈরি হওয়া প্রতিটি মতবাদের গোড়াপত্তন এই তিনটি যুগে।

১. রেনেসাঁ (আনুমানিক ১৪শ শতক–১৬শ শতক; ইতালিতে শুরু, পরে ইউরোপজুড়ে বিস্তার) :

ফরাসি ও ইংরেজি Renaissance; ইতালীয় Rinascita শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো পুনর্জন্ম। শব্দটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, ইউরোপে সমাজ, চিন্তা, বিদ্যাচর্চা ও শিল্প-সাহিত্যে যে রূপান্তর ঘটেছিল ১৪শ শতকের শেষ ভাগ থেকে ১৭শ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত।

রেনেসাঁ মানুষের মধ্যে যে নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটায় তা হলো :

ক. মানবতাবাদ (Humanism)।

খ. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism)।

গ. ইহজাগতিকতা (Secularism)।^(৪৪)

২. রিফরমেশন (আনুমানিক ১৫১৭–১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দ; মার্টিন লুথারের আন্দোলন থেকে শুরু, ওয়েস্টফেলিয়ার শান্তিচুক্তি পর্যন্ত) :

১৫১৭ সালে জার্মান যাজক মার্টিন লুথারের মাধ্যমে গির্জার বিরুদ্ধে এক

^{৪৪} বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রতিটি বিষয়ের পরিচয় বিস্তারিত আসবে ইনশাআল্লাহ।

আন্দোলন শুরু হয়, যাকে রিফরমেশন আন্দোলন বলা হয়। এই আন্দোলনের ফলে খ্রিষ্টান ধর্মে এক নতুন দলের উদ্ভব ঘটে, যাদেরকে প্রোটেষ্ট্যান্ট বলা হয়। ক্যাথলিক গির্জার অনাচারের বিরুদ্ধে যেহেতু লুথার প্রতিবাদ বা প্রোটেষ্ট করেছিল, তাই একসময় তার এই আন্দোলন ‘প্রোটেষ্ট্যান্ট আন্দোলন’ নাম ধারণ করে। রেনেসাঁর সময় থেকে যত আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার সবগুলোই ছিল বাহির থেকে, কিন্তু রিফরমেশন বা প্রোটেষ্ট্যান্ট আন্দোলন ছিল ধর্মের একদম ভেতর থেকে এবং ধর্ম-সংস্কারের নামে। এই আন্দোলন খ্রিষ্টধর্মকে ইউরোপ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

গবেষক হাসান আসকারী লেখেন, ‘রেনেসাঁ ও রিফরমেশন একসাথে হাত ধরাধরি করে চলে। সাধারণত পাশ্চাত্য লেখকগণ প্রথম আন্দোলনকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং দ্বিতীয় আন্দোলনকে তার শাখা বলে মনে করেন। কিন্তু খ্রিষ্টান চার্চ যদি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাহলে রেনেসাঁর অধীনে যত প্রাদুর্ভাব-প্রবণতা ছড়িয়েছে, এত সহজে শিকড় পেত না।’^(৪৫)

৩. এনলাইটেনমেন্ট (আনুমানিক ১৬৮০–১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দ; ১৭শ শতকের শেষ থেকে ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত) :

রেনেসাঁ ও রিফরমেশনের মধ্য দিয়ে চলমান বিশ্বকে নতুনভাবে দেখার যুক্তিবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও হিউম্যানিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গির যে আন্দোলন এত দিন সমাজের বিভিন্ন স্তরে চলে এসেছে, অষ্টাদশ শতকে তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী হয়ে যায় এবং ইউরোপে মডার্নিজমই একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এইজন্যই এই যুগকে এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকিত যুগ বলা হয়। অর্থাৎ মানুষ এখন গ্রীক দর্শন ও শিক্ষার মাধ্যমে আলোকিত হয়ে গেছে। এই হিসেবে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন নতুন কিছু ছিল না। পূর্বের রেনেসাঁ ও রিফরমেশন আন্দোলনের ফলে ইউরোপে ধর্মহীন যে পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, তার একটি আনুষ্ঠানিক পর্ব শুরু হয় এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের মাধ্যমে। পরিবর্তন যা হয়েছিল তা হলো, পূর্বের সমাজে যারা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি লালন করত, তারাই হতো সমাজের অভিজাত চিন্তার অধিকারী; কিন্তু এনলাইটেনমেন্টের পর থেকে অভিজাত চিন্তা হিসেবে ইউরোপে শুধু তা-ই স্বীকৃত হতে লাগল যা যুক্তিগ্রাহ্য এবং শুধুই দুনিয়ার জীবনে মানুষের উন্নতির পথের সন্ধান দেয়। এককথায়, পূর্বের ধর্মহীন মূল্যবোধগুলোকেই সামাজিক স্বীকৃতি দেয় এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন।

^{৪৫} জাদিদিয়াত, পৃ. ৪৫, অধ্যায় : নাশআতে সানিয়া : জাদিদিয়াত কা আগাজ

‘এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের সমস্ত দার্শনিক চারটি মূলনীতির ওপর একমত হয়েছিল : প্রথমত, এই কথার ওপর বিশ্বাস রাখা যে, মানুষের যুক্তিই চূড়ান্ত দলিল। দ্বিতীয়ত, এই দুনিয়া প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নীতিমালার ওপর চলমান। (এখানে অদৃশ্য কারও হস্তক্ষেপ নেই।) তৃতীয়ত, রাষ্ট্রশাসনে সব ধরনের ইলাহি বিধানের প্রত্যাখ্যান করা। চতুর্থত, সমাজের ধারাবাহিক উন্নতি।’^(৪৬)



^{৪৬} ইতিহাসের আয়নায় বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা, পৃ. ১৪৪, রুহামা পাবলিকেশন

মুদ্রা ভূমিকা

জাহিলিয়াত ও আধুনিক জাহিলিয়াত

কোনো বিষয় জাহিলিয়াত হিসেবে চিহ্নিত হলেও তার বিষয়ে আমাদের মৌলিক কয়েকটি মূলনীতি মনে রাখতে হবে।

প্রথমত, যেকোনো জাহিলিয়াতেরই কোনো বিশেষত্ব, বিশেষ গুণ বা উঁচু অবদান থাকা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। সম্ভবত কোনো জাহিলিয়াতই এর থেকে খালি নয়। কিন্তু তা এটা প্রমাণ করে না যে, সে জাহিলিয়াত সুস্থ জীবনযাপন করেছে, অথবা সে জাহিলিয়াত অনুসরণযোগ্য বা তার থেকে কিছু গ্রহণীয় রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, জাহিলিয়াতের কোনো বিশেষত্ব, উত্তম গুণ ও উন্নত অবদান থাকলেই তা জাহিলিয়াতের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে যায় না। কেননা, তার মধ্যে এমন কিছু বিকৃতি ও ভ্রষ্টতা রয়েছে যা এসব বিশেষত্ব, গুণ ও উন্নত অবদানকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট ও ধ্বংস করে দেবে, তাতে সন্দেহ নেই।

তৃতীয়ত, এসব বিকৃতি ও ভ্রষ্টতার প্রধান কারণই হচ্ছে, জাহিলিয়াতগুলো সর্বদা সর্ববিষয়ে নিজ প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা কিংবা সংকীর্ণ মানবীয় গুণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। কেননা, তা আল্লাহর হেদায়েত জানে না, চেনেও না। অথবা হয়তো চেনে ও জানে; কিন্তু তা ত্যাগ করে অন্য কিছু গ্রহণ করে।^(৪৭)

জাহিলিয়াতের ব্যাপারে এই তিনটি মূলনীতি সামনে রেখে আমরা জাহিলিয়াতের এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করব, যা ইতিহাসের প্রতিটি জাহিলিয়াতের মাঝে পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি জাহিলিয়াতের নিজস্ব স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তাকে অন্য জাহিলিয়াত থেকে আলাদা করে। কিন্তু কিছু বৈশিষ্ট্য এমন আছে, যা সব জাহিলিয়াতের মাঝেই পাওয়া যায়।

প্রথম বৈশিষ্ট্য : সকল জাহিলিয়াতের মাঝে একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো,

^{৪৭}. জাহিলিয়াতুল করনিল ইশরিন, মুহাম্মদ কুতুব, পৃ. ৩৬, (জাহিলিয়াতের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৩৮, ইফতিখার সিফাত অনূদিত, রুহামা পাবলিকেশন)

আল্লাহর ওপর সত্যিকারভাবে ঈমান না আনা। হয়তো আল্লাহর সাথে কাউকে শিরক করবে, অথবা আল্লাহকে অস্বীকার করবে, অথবা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার তো করবে, কিন্তু দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহর কোনো হস্তক্ষেপ নেই এমন বিশ্বাস করবে। মোটকথা, আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ববাদের মৌলিকত্বের ওপর সঠিকভাবে ঈমান না-থাকাই হলো জাহিলিয়াতের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : নিজস্ব চিন্তাভাবনা, ইচ্ছা ও কামনা-বাসনার অনুসরণ করা। এটা প্রথম বৈশিষ্ট্যের একটি অনিবার্য রূপ। হয়তো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে, যা থেকে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পিত হওয়া এবং তারই নাজিলকৃত বিধান পালনের আবশ্যিকতা সৃষ্টি হয়। অথবা জাহিলিয়াতকে মেনে নিতে হবে, যা মানুষের প্রবৃত্তি-ইচ্ছার অনুসরণকে আবশ্যিক করে। কেননা, আল্লাহর বিধান ভিন্ন সকল বিধানই নিছক কামনা-বাসনা মাত্র।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : সকল জাহিলিয়াতের মাঝে একটি বৈশিষ্ট্য হলো তাতে আল্লাহদ্রোহী তাগুত গোষ্ঠীর উপস্থিতি। তারা সর্বক্ষণ ও সর্বাত্মক চেষ্টায় থাকে, যাতে মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদত থেকে এবং এক আল্লাহর দেওয়া শরিয়ত পালন থেকে বিরত রাখতে পারে; আর মানুষকে তাগুতের দাসত্ব এবং তাদের শরিয়ত পালনের দিকে ধাবিত করতে পারে। (যা তারা নিজেদের প্রবৃত্তির ভিত্তিতে রচনা করেছে)

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : প্রবৃত্তির চাহিদার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া। প্রবৃত্তির কিছু চাহিদা মানুষের খুবই প্রিয় জিনিস বা তার জীবনের অংশ। এটাকে আল্লাহ মানুষের জন্য বৈধ করেছেন। কিন্তু যখনই সে চাহিদাগুলো তার বেঁধে দেওয়া সীমা ও যুক্তিসংগত পরিমাণ অতিক্রম করে, তখন তা মানুষকে পশুতে পরিণত করে এবং আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই দেখা যায়, প্রতিটি জাহিলিয়াতের মাঝে একটি চিরাচরিত রূপ হলো, প্রবৃত্তির চাহিদার স্রোতকে জীবনের মূলধারার মাঝে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে দেওয়া। এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, দুনিয়ার কোনো জাহিলিয়াতই সব ধরনের অশ্লীলতা ও যিনা-ব্যভিচারকে পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেনি। তারা অশ্লীলতার বিভিন্ন রূপকে মানুষের সমাজে বাকি রেখেছে এবং সমাজের একটি অংশে পরিণত করেছে।

উপর্যুক্ত নিদর্শনগুলো থেকে ইতিহাসের কোনো জাহিলিয়াতই মুক্ত নয়। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতা পূর্বোক্ত সে জাহিলিয়াতকে আধুনিক ছাঁচে তৈরি করে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে, যেগুলো স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে পারলে আধুনিক এই ঈমান-বিধ্বংসী জাহিলিয়াত বোঝা আমাদের জন্য সহজ হবে। সে

স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১. চরম বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ, যা মানুষকে আল্লাহর হেদায়েত থেকে দূরে সরানো এবং আল্লাহর সৃষ্টিকুলকে চরম দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

২. বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও উন্নতি উৎকর্ষের নেশায় মত্ত হয়ে মানুষকে আল্লাহর মোকাবেলায় দাঁড় করানো; যেন মানুষ এই কথা মনে করে যে, বর্তমানের এই চরম উন্নত যুগে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন মানুষের নেই, অথবা মানুষ নিজেই নিজের ইলাহ হয়ে গেছে।

৩. বিভিন্ন মডার্ন বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও মতাদর্শসমূহ, যেগুলো সমাজ, অর্থনীতি ও মনস্তত্ত্বসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানবজীবনকে চরম ভ্রষ্ট, সঠিক পথবিচ্যুত ও বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

৪. বিবর্তনবাদী দর্শন।

৫. নারীস্বাধীনতা ও নারীবাদ।

৬. লিবারেলিজম, সেক্যুলারিজম, হিউম্যানিজম, জাতীয়তাবাদ-সহ আধুনিক বিভিন্ন মতবাদের বিস্তার, যেগুলো মিষ্টি মিষ্টি স্লোগানের মাধ্যমে খুব সহজেই মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব থেকে বের করে নিয়ে আসছে।

৭. বশীভূত ও মোহগ্রস্তকারী বিস্তৃত এক বিনোদনব্যবস্থা ও সংস্কৃতি, যা মানুষকে প্রবৃত্তির গোলাম বানাচ্ছে এবং তাদের নৈতিকতা আর মানবপ্রকৃতিকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করছে।^(৪৮)



^{৪৮}. জাহিলিয়াতুল করনিল ইশরিন, মুহাম্মদ কুতুব, পৃ. ৪২-৫২ সংক্ষেপিত ও ঈষৎ সংযোজিত (জাহিলিয়াতের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৫৮-৭২, ইফতিখার সিফাত অনূদিত, রুহামা পাবলিকেশন)

শ্রীমদ্ভক্তি পরিভাষা বিভাট (৪৯)

শুধু ইসলাম ধর্মের ইতিহাসই নয়, অন্যান্য ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়নেও এ কথা প্রমাণিত যে, ধর্মের মাঝে বিভিন্ন গোমরাহি ও ভ্রষ্টতা, সন্দেহ ও সংশয় সর্বকালেই বিদ্যমান। ওলামায়ে কেরাম বলে থাকেন, ‘পশ্চিমা শিক্ষিতরা ইসলাম সম্পর্কে এমন কোনো সন্দেহ-সংশয় বা আপত্তি হাজির করতে পারবে না, যা নতুন এবং যার জবাব পূর্ব থেকেই আমাদের কাছে বিদ্যমান নেই।’ তাদের এই বক্তব্য শতভাগ সঠিক। গোমরাহি—আধুনিক বা উত্তরাধুনিক—যে অবয়বেই সামনে আসুক, ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, মৌলিকভাবে আমাদের পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরাম তার পোস্টমর্টেম পূর্বেই করে এসেছেন। এজন্য আলেমদের জন্য এসব গোমরাহি চিহ্নিত করা ও তার খণ্ডন করা একদম সহজ। কিন্তু নতুন গোমরাহিসমূহে এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে, যা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে না পারলে সেগুলোর খণ্ডনে যথাযথ ফলাফল পাওয়া যায় না।

১। অতীতে গোমরাহি নির্দিষ্ট একটা গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকত। ঘরানার বিবেচনায় যেমন, সংখ্যার বিবেচনায়ও তেমন। যার ফলে ওলামায়ে কেরাম গোমরাহির আদ্যোপান্ত প্রকাশ করে দিলেই, হয়তো তা পরিপূর্ণ বিলীন হয়ে যেত, অথবা তার প্রভাব মানুষের মাঝে শেষ হয়ে যেত। অপরদিকে আধুনিক গোমরাহির প্রভাব পুরো দুনিয়াব্যাপী; যাতে শুধু মুসলমানরাই নয়, অপরাপর ধর্মের অনুসারীরাও সমানভাবে আক্রান্ত। ফলে এই গোমরাহির গণ্ডি ও প্রভাব ধীরে ধীরে বেড়েই চলছে।

২। ইসলামের ইতিহাসে যেসকল গোমরাহি দ্বারা মুসলিমরা আক্রান্ত হয়েছে, তা

^{৪৯}. লেখাটি নেওয়া হয়েছে প্রফেসর হাসান আসকারী রচিত *জাদিদিয়াত* বই থেকে। এই বই সম্পর্কে মুফতি তাকী উসমানি দা. বা.-এর মূল্যায়ন হলো, ‘লেখক ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসকে এমন সমগ্রতা, সংক্ষিপ্ততা এবং শৃঙ্খলার সাথে বর্ণনা করেছেন, যেন বিন্দুতে সিঁদুর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ... বইটি দীনি মাদরাসার ওলামা ও তালেবে ইলমের জন্য এক মহামূল্য গনিমত।’ বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে নাশাত পাবলিকেশন।

মুসলিমদের মধ্য থেকেই সৃষ্ট ছিল। অপরদিকে বর্তমানে যেসকল গোমরাহি দ্বারা মুসলমানরা বেশি আক্রান্ত, তা পশ্চিম থেকে আসা। এসব গোমরাহি বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিমারা অটেল সম্পদ ও পুরোদস্তুর সামরিক শক্তি ব্যবহার করছে। পাশাপাশি হাজির করছে এমন সব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, যা মানুষের কুপ্রবৃত্তি ও খাহেশাতে নাফসানির পুরোপুরি অনুকূল। তাই মানুষ এগুলোকে আকল ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখে না; বরং **ইন্দ্রিয় পর্যবেক্ষণকে যৌক্তিক দলিল ভেবে বসে থাকে।** তাই ওলামায়ে কেরাম যখন এসব ফিতনা ও গোমরাহির জবাব দেন, মানুষের মাঝে তার বিশেষ কোনো প্রভাব পড়ে না।

৩। বিগত ছয়শো বছর যাবৎ ধাপে ধাপে ইউরোপীয়রা মানসিক বিকৃতির শিকার হয়েছে। বর্তমানে তারা সত্য গ্রহণের মানসিকতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে বসেছে। এই ছয়শো বছরে তারা যত ভ্রষ্টতা সৃষ্টি করেছে, তার সবগুলো একসাথে তারা মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে। যার কারণে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম তার ধর্মের ব্যাপারে যতই সচেতন হোক না কেন, ধৈর্যে আসা এই ফিতনার কবল থেকে পূর্ণরূপে বেঁচে থাকতে পারছে না। এক গোমরাহি থেকে কোনোভাবে বেঁচে গেলেও অন্য গোমরাহি এসে ঘিরে ধরছে অষ্টোপাসের মতো। এভাবে গত এক-দেড়শো বছরে আমাদের মুসলিম সমাজের সাধারণ মানুষ, বিশেষত পশ্চিমা শিক্ষিতরা মানসিকভাবে চরম বিকৃতির শিকার হয়েছে।

৪। পুরাতন গোমরাহিগুলো ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ পরিভাষা ও ধ্যান-ধারণাসমূহকে ভুলভাবে উপস্থাপন করত, যেগুলো খণ্ডন করা ছিল ওলামায়ে কেরামের জন্য একদম সহজ কাজ। কিন্তু আধুনিক গোমরাহিগুলো মানুষের সামনে হাজির হচ্ছে নতুন অবয়বে, নতুন পরিভাষার মোড়কে। তাই দেখা যায়, তুচ্ছাতুচ্ছ বিভিন্ন মতবাদকে বড় বড় পরিভাষার আড়ালে এমনভাবে লুকিয়ে ফেলা হয় যে, মানুষ অকারণেই তাতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

ওলামায়ে কেরাম যেহেতু এই নতুন ভাষা ও পরিভাষার সামগ্রিক ইতিহাস, প্রেক্ষাপট, গভীরতা ও চতুরতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল নন, তাই কখনো কখনো তাদের খণ্ডন সমস্যার গোড়ায় পৌঁছায় না।

এসব আধুনিক পরিভাষা সাধারণত দু-ধরনের হয়ে থাকে, কিছু পরিভাষা এমন যেগুলো খ্রিষ্টান ধর্ম থেকে আগত। আর কিছু পরিভাষা এমন যেগুলো বিভিন্ন ধর্মের মাঝেই পাওয়া যায়। এগুলোকে খুবই উদারতার সাথে ব্যবহার করা হয়। শব্দের বাহ্যিকতা থেকে প্রত্যেকের কাছে তা নিজ ধর্মীয় পরিভাষা বলে মনে হলেও, বস্তুত সেগুলো দ্বারা আধুনিক অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ইউরোপের সকল গোমরাহি মূলত এই পন্থায়ই হয়েছিল।

এই সমস্ত পরিভাষার বিকৃত অর্থ এক জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; প্রত্যেক বিশ-পাঁচিশ বছর অন্তর অন্তর তাতে পরিবর্তন হতে থাকে। নব্বইয়ের দশকে এসে তো শব্দের পরিবর্তন পাঁচ বছর পরপর পালটাতে থাকে। শুধু তা-ই নয়, পশ্চিমাদের দেখা যায়, একই জামানায় একটি শব্দকে দশজন চিন্তাবিদ দশ রকম অর্থে ব্যবহার করছে। এই ধরনের শব্দগুলোর মাঝে একটি হলো ‘ফিতরাত’। শুধু ‘ধর্ম’ শব্দটিকেই তারা এত বেশি অর্থে ব্যবহার করেছে যে, এর মূল অর্থ আর তাদের কাছে অবশিষ্ট নেই।

পশ্চিমা লেখকরা নিত্যনতুন পরিভাষা উদ্ভাবনে বেশ আগ্রহী হয়ে থাকে। নিজেদের লেখাজোখায় নতুন কোনো তথ্য দিতে পারুক আর না পারুক, নতুন পরিভাষা দেওয়ার কাজটা তারা সুচারুভাবেই আঞ্জাম দিয়ে থাকে। এগুলো আবার দু-ধরনের হয় : **এক**, কিছু ফুলানো-ফাঁপানো গম্ভীর ধরনের শব্দ, আদতে যেগুলোর সুনির্দিষ্ট কোনো অর্থই নেই, কিন্তু বাহ্যত তক-বাক প্রচুর। তাদের লেখায় এ-জাতীয় শব্দ ও পরিভাষার ব্যবহার এত অধিক থাকে যে, পাঠক লেখা থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য বের করতে পারে না। **দুই**, কিছু পরিভাষা এমন, বাহ্যত যা খুবই সুন্দর এবং শব্দ-ঝংকারে ব্যক্তির মাঝে ভাবাবেগ তৈরি করতেও সক্ষম।

এই দু-ধরনের পরিভাষারই আসল উদ্দেশ্য—পাঠক যেন বিবেক দ্বারা বিষয়গুলো গভীরভাবে ভেবে না দেখে, বরং শুধু পরিভাষার পেছনে অন্ধের মতো ছুটে চলে।

এই ফিতনা ও গোমরাহির মোকাবেলায় আমাদের ওলামায়ে কেরামের কাজ তখনই ফলপ্রসূ হবে, যখন তারা পশ্চিমাদের এই জালকে গোড়া থেকে বুঝবে এবং তাদের জাল বিছানোর পদ্ধতি সম্পর্কে সত্যিকার অবগত হবে।



নবম ভূমিকা

পরিভাষার অজ্ঞতা : পশ্চিমের ইসলামিকরণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার^(৫০)

দুনিয়ার সকল জ্ঞানশাস্ত্রের নিজস্ব পরিভাষা রয়েছে এবং প্রতিটি জ্ঞানশাস্ত্রকে তার সে পরিভাষার প্রকৃত মর্ম উদ্ধার ছাড়া বোঝা করা সম্ভব নয়। ভিন্ন ভাষার পরিভাষাগুলো বোঝার ক্ষেত্রে প্রচলিত একটি পদ্ধতি হলো, নিজস্ব ভাষায় সে পরিভাষার সমার্থবোধক শব্দ খোঁজা এবং সে শাব্দিক অর্থ দিয়ে সে পরিভাষাটি বোঝা। কিন্তু পরিভাষার মর্মোদ্ধারের এই পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য কোনো পদ্ধতি নয়। কেননা প্রতিটি পরিভাষা তৈরির—চাই তা ইসলামি হোক বা অনৈসলামি—নির্দিষ্ট ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি থাকে। আর সেগুলোর জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology), অস্তিত্বতত্ত্ব (Ontology), সৃষ্টিতত্ত্ব (Cosmology) ও অধিবিদ্যা (Metaphysics) থেকেই পরিভাষাটি তৈরি হয়। পরিভাষা অন্যের কাছে নিজের চিন্তা পৌঁছানোর শুধু একটি মাধ্যমই নয়; বরং তা একটি জাতির ইতিহাস ও দর্শনের আয়না। এজন্য কোনো পরিভাষার প্রকৃত মর্ম উদ্ধার করা তার অধিবিদ্যাগত (Metaphysical) পটভূমি জানা ছাড়া সম্ভব নয়। এই সূক্ষ্ম বিষয়টি একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক। Dead Labour মার্ক্সবাদীদের একটি নিজস্ব পরিভাষা। যার শাব্দিক অর্থ হয় ‘মৃত মজদুর’ বা ‘মৃত শ্রমিক’। অথচ মার্ক্সবাদীদের পরিভাষায় এর মর্ম হলো ‘পুঁজি’।

একজন মুসলমান চাই সে যতই সঠিক ও মজবুত আকিদা-বিশ্বাসের অধিকারী হোক না কেন, যদি সে পশ্চিমা পরিভাষার প্রকৃত মর্ম ও বাস্তবতা না জানে, তাহলে সে পশ্চিমা মতবাদগুলোকে শুধু শাব্দিক কিছু মিলের কারণে ইসলামিকরণ করতে থাকবে।

যেসকল মডার্নিস্টরা পশ্চিমা পরিভাষাগুলোর ইসলামিকরণ করে, তাদের মৌলিক একটি ভুল হলো, তারা পশ্চিমা পরিভাষাগুলোর বাহ্যিক ও আংশিক

^{৫০} লেখাটি কিছুটা পরিমার্জন, সংক্ষেপণ ও সংযোজনসহ নেওয়া হয়েছে পাকিস্তানি গবেষক জাফর ইকবাল রচিত *ইসলাম আউর জাদিদিয়াত কা মশামাকাশ* (পৃ. ৭, ৮, ৯) গ্রন্থ থেকে।

কিছু মিল দেখেই সেগুলোকে ইসলামি বিভিন্ন পরিভাষার ওপর কিয়াস করে ফেলে এবং ‘উভয়টি একই’ এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। যেমন ধরুন, Democracy বা গণতন্ত্র পশ্চিমের নির্দিষ্ট দর্শন থেকে উঠে আসা একটি পরিভাষা। ইসলামের শুরায়ি নেজামের সাথে এর আসমান-জমিন তফাত থাকলেও, আংশিক মিল দেখা যায়। এখন এই আংশিক ও বাহ্যিক কিছু সামঞ্জস্য প্রভাবিত হয়ে গণতন্ত্রের পশ্চিমা দর্শন, ইতিহাস এবং যে অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের ওপর তা প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোর সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরা গণতন্ত্রকে ইসলামিকরণ করে ফেলে। অথচ উসুলে ফিকহ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা রাখা ব্যক্তিও জানে, একটি বিষয়কে আরেকটি বিষয়ের ওপর কিয়াস করতে হলে উভয়ের মাঝে অনেকগুলো মৌলিক বিষয়ে মিল থাকতে হয়; অন্যথায় সে কিয়াস শাস্ত্রীয় বিবেচনায় ‘কিয়াস মাআল ফারিক’ বলে বিবেচিত হয়। পরিভাষার এই মৌলিক ভুল ও অজ্ঞতার কারণে মডার্নিস্টরা পশ্চিমের অসংখ্য বিষয়কে ইসলামের মাঝে খুঁজে পায় এবং সেগুলোকে ইসলামিকরণ করে হয় মানুষকে ধোঁকা দেয় অথবা নিজেরা ধোঁকা খায়।

পরিভাষা বোঝার সঠিক পদ্ধতি

মানবতাবাদ (Humanism), যুক্তিবাদ (Rationalism), রেনেসাঁ (Renaissance), এনলাইটেনমেন্ট (Enlightenment), ব্যক্তি স্বাভাবিকতাবাদ (Individualism), সমতা (Equality), স্বাধীনতা (freedom), পুঁজিবাদ (Capitalism) সহ পশ্চিম থেকে উঠে আসা প্রতিটি পরিভাষাকে শাব্দিকীকরণ না করে এবং বাহ্যিক মিলের পেছনে না পড়ে, সেগুলোর জ্ঞানতত্ত্ব এবং যে অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের ওপর সেগুলো প্রতিষ্ঠিত, তার আলোকে বোঝা অত্যন্ত জরুরি। তেমনিভাবে ইসলামি পরিভাষাগুলোও নিজস্ব জ্ঞানতত্ত্ব ও অতিপ্রাকৃত কিছু বিশ্বাসের পটভূমিতে তৈরি হয়েছে। প্রতিটি পরিভাষায় নিজস্ব মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও মনস্তত্ত্ব রয়েছে। যেমন : সুন্নাত, ইজমা, ইজতিহাদ, মাকাসিদে শরয়ীয়াহ, আজমতে সাহাবা, ফাতাওয়া, তাকলিদ, তালফিক, ইম্মত, ইবারাতুন নস, দালালাতুন নস, ইশারাতুন নস, ইকতিয়ায়ুন নস, ইসতিহসান, মাজাযে মুরসাল ইত্যাদি অসংখ্য পরিভাষার গঠন, গড়ন ও সৃষ্টি নির্দিষ্ট জ্ঞানতত্ত্ব ও কিছু বিশ্বাসের পটভূমিতেই তৈরি হয়েছে, যেগুলোর শাব্দিকীকরণ করে বোঝা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়; বরং এগুলোকে বুঝতে হলে এগুলোর নিজস্ব ইতিহাস, জ্ঞানতত্ত্ব ও অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসগুলো জানতে হবে।

মোটকথা, প্রতিটি পরিভাষার নির্দিষ্ট জ্ঞানতত্ত্ব ও অতিপ্রাকৃত (Specific Epistemological Metaphysical) পটভূমি জানা ছাড়া সেগুলোর মৌলিক বাস্তবতা উদ্ধার করা সম্ভব নয়।